সমাজকেও টিকিয়ে রেখেছে।

সরকারী গেজেটিয়রে জয়সলমের অঞ্চলের যে বর্ণনা, তা যথেষ্ট ভয়াবহ। এখানে একটাও নিত্যবহ নদী নেই, ভৌমজল একশো পঁচিশ থেকে দুশো পঞ্চাশ ফিট নীচে। কোথাও কোথাও তার গভীরতা চারশো ফিটেরও বেশি। বর্ষা অবিশ্বাস্যভাবে কম— মাত্র ষোলো দশমিক চার সে.মি.। বিগত সত্তর বছরের তথ্য অনুসারে, এ অঞ্চল বছরে তিনশো পঞ্চান্ন দিনই বৃষ্টিহীন। অর্থাৎ একশো কুড়ি দিনের বর্ষা ঋতু এখানে তার সংক্ষিপ্ততম রূপে, মাত্র দশ দিনের জন্যই আসে।

পরিসংখ্যানটি অবশ্য আধুনিকদের। মরুভূমির সমাজ তো এই দশ দিনের বর্ষায় কোটি কোটি রজত বিন্দু অনুভব করেছে এবং তাকে ঘরে, গ্রামে, শহরে— সম্ভাব্য প্রতিটি জায়গায় সংগ্রহ করার কাজ চালিয়ে গেছে। যে তপস্যার ফলাফল দাঁড়িয়েছে নিম্নরূপঃ

জয়সলমের জেলায় আজ পাঁচশো পনেরোটি গ্রাম আছে। এর মধ্যে তিপ্পান্নটি গ্রামে কোনো না কোনো কারণে এখন আর বসতি নেই। বসতি রয়েছে চারশো বাষট্টিটি গ্রামে। এর মধ্যে মাত্র একটি বাদ দিলে বাকি প্রতিটি গ্রামেই পানীয় জলের ব্যবস্থা রয়েছে। যে গ্রামগুলি উঠে গেছে, সেই গ্রামগুলোতেও এই ব্যবস্থা এখনও বহাল রয়েছে। সরকারি বিবরণ অনুযায়ী-ই, জয়সলমেরের শতকরা নিরানব্বই দশমিক সাত আট ভাগ গ্রামেই পুকুর, কুয়ো অথবা 'অন্য' কোন জলের উৎস বর্তমান। এর মধ্যে নলকূপ বা নলবাহিত সরবরাহ ব্যবস্থা খুবই কম। এই সীমান্তবর্তী জেলার পাঁচশো পনেরোটি গ্রামের মধ্যে শতকরা কেবল এক দশমিক সাত পাঁচটি গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে। হিসেবের সুবিধার জন্য এই সংখ্যাটিকে শতকরা দুইও যদি ধরি তাহলেও দাঁড়ায় মাত্র এগারোটি গ্রাম। যেহেতু এই পরিসংখ্যান উনিশশো একানব্বই সালের, তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে ইতিমধ্যে আরো কিছুটা উন্নতি হয়েছে— তাই এর সঙ্গে আরও কুড়ি-তিরিশটা গ্রাম যোগ করে নেওয়া যাক; তবুও পাঁচশো পনেরোটির মধ্য বিদ্যুৎ সংযোগ আছে এমন গ্রামের সংখ্যা নগণ্যই থেকে যায়। এর অর্থ এখানে বেশিরভাগ গ্রামেই নলকূপ বিদ্যুতে নয়, ডিজেলে চলে। তেল আসে বাইরে, অনেক দূর থেকে। তেলের ট্যাঙ্কার না এলে পাম্প চলবে না, জলও উঠবে না। সবকিছু ঠিকঠাক চললেও নলকূপগুলোতে আগে-পরে জলস্তর নেমেই যাবে বাড়বে না। জলস্তরের অবস্থান একই গভীরতায় ঠেকিয়ে রাখার কোনো উপায় আজও আবিষ্কার হয়নি। সাধারণভাবে বলা যায় যে জয়সলমেরে ভূ জলের ভাণ্ডার ভালোই। কিন্তু ভাণ্ডে কিছুমাত্র জমা না দিয়ে শুধুই যে তুলে

নেওয়ার প্রবৃত্তি – এতো একদিন আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করবেই।

আরও একবার স্মরণ করে নেওয়া যাক, মরুভূমিতে ভয়াবহ বলে চিহ্নিত এই এলাকায় নিরানব্বই দশমিক সাত আট শতাংশ গ্রামেই পানীয় জলের ব্যবস্থা রয়েছে এবং তা সম্ভব হয়েছে গ্রামের মানুষের নিজস্ব উদ্যোগেই। এর সঙ্গে তুলনা করা যাক, মানুষকে আধুনিক সুযোগ সুবিধা দিতে দায়বদ্ধ যেসব সরকারী সংস্থাগুলি তাদের পরিসংখ্যানগুলির। এখনও পর্যন্ত মাত্র উনিশ শতাংশ গ্রাম পাকা রাস্তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ডাক ব্যবস্থার সুবিধা আছে ত্রিশ শতাংশ গ্রামে এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা পৌঁছেছে মাত্র নয় শতাংশ গ্রামে। শিক্ষার প্রসার তুলনামূলক ভাবে কিছুটা ভাল। শতকরা পঞ্চাশ ভাগ গ্রামে এর বিস্তার। কিন্তু এখানে এ বিষয়টাও লক্ষ্য রাখা দরকার যে, ডাক, চিকিৎসা, শিক্ষা বা বিদ্যুতের সুবিধা পাওয়ার জন্য শুধু একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার প্রয়োজন, যেটা সরকারী কোষাগার থেকে ধার্য করাই থাকে। কম পড়লে অন্য কোন খাত বা অনুদান সূত্রে টাকার পরিমাণ বাড়ানোও যেতে পারে। তবু আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই পরিসেবাগুলো এখনও যেন প্রতীক হিসেবেই রয়েছে।

জলের সমস্যা ও তার সমাধান কিন্তু এরকম নয়। এখানে প্রকৃতি থেকে যতটুকু জল পাওয়া যাবে সমাজ তাকে কোনোমতেই বাড়াতে পারে না। এখানে বাজেট একদম স্থির। যতটুকু পাওয়া যাবে, তাতেই কাজ চালাতে হবে। তবুও সমাজ এই কাজ বাস্তবে করে দেখিয়েছে। পাঁচশো পনেরোটি গ্রামে নাড়ি, তলাইয়ের সংখ্যা ছেড়েই দেওয়া যাক, বড় পুকুরের সংখ্যাই দুশো চুরানব্বইটি।

আধুনিক সমাজ যে স্থানটিকে হতাশাজনক বলে পরিত্যাগ করেছে, সেখানে ভারত পাকিস্তান সীমান্তে 'আসুতাল' অর্থাৎ 'আশার পুকুর' রয়েছে। যেখানে তাপমাত্রা পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ছুঁয়ে যায় সেখানে রয়েছে 'সিতলাই' অর্থাৎ 'শীতল পুকুর'। আর বৃষ্টি যেখানে সবথেকে বেশি বিশ্বাসঘাতকতা করে, সেখানেও রয়েছে 'বদরাসর'।

চূড়ান্ত সাবধানতার সঙ্গে জল সংগ্রহ এবং বাস্তবসম্মতভাবে তার ব্যবহার এই মানসিকতাকে বুঝতেই পারেনি সমাজ ও প্রশাসনের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা গেজেটিয়র। তারা এই মরুভূমিকে 'জনহীন, বীভৎস, নিরানন্দ ও নিষ্প্রাণ' বলে বর্ণনা করেছে। কিন্তু গেজেটিয়রে যারা এই কথা লিখেছিল, 'ঘড়সিসরে' পৌঁছালে তারাও ভুলে যায় যে তারা মরুভূমিতেই রয়েছে।

কাগজে পর্যটন-মানচিত্রে জয়সলমের যত বড় শহর প্রায় তত বড়ই পুকুর

ঘড়সিসর। মানচিত্রে যেমন, বাস্তবের মরুভূমিতেও এরা পরস্পরসংলগ্ন হয়েই বিরাজ করছে। ঘড়সিসর ছাড়া জয়সলমের শহর গড়ে ওঠা সম্ভবই হত না। প্রায় আটশো বছরের পুরোনো এই শহরের, অন্তত সাতশো বছরের প্রতিটি দিন, এই ঘড়সিসরের এক একটি জলবিন্দুর সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে আছে।

বালির এক বিশাল টিলা সামনে দাঁড়িয়ে। কাছে গেলেও মনে হবে না যে, টিলা নয়; এ হল ঘড়সিসরের উঁচু এবং বিস্তৃত, লম্বা-চওড়া একটি পাড়। কিছুটা এগিয়ে গেলে দেখা যাবে দুটো মিনার, পাথরের ওপর সুন্দর নকশা কাটা পাঁচটা জানালা এবং দুটো ছোট ও একটা বড় প্রবেশ-দ্বার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। বড় ও ছোট দ্বরের সামনে নীল আকাশ ঝকঝক করছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলে প্রবেশ-দ্বার থেকে যতটা দেখা যায়, তার সঙ্গে নতুন নতুন দৃশ্য যোগ হতে থাকে। এই পর্যন্ত পৌঁছেই বোঝা যাবে যে, প্রবেশ-দ্বার থেকে যে নীল আকাশ দেখা যচ্ছিল, তা আসলে সামনে ছড়িয়ে থাকা ঘড়সিসরের নীল জল। এরপর ডাইনে-বাঁয়ে সুন্দর পাকা ঘাট, মন্দির, চাতাল, স্তম্ভ ঘেরা সুসজ্জিত বারান্দা, ঘর এবং না-জানি আরও কত কী। প্রতি মুহূর্তে বদলাতে থাকা দৃশ্যাবলী পেরিয়ে পুকুরের সামনে পৌঁছে বিশ্রাম নেবার সময় চোখ সামনের দৃশ্যগুলির বিশেষ কোনো একটার ওপর স্থির হতে পারে না। প্রতি মুহূর্তে ঘুরে ঘুরে চোখের মণি চারপাশে ছড়ানো বৈচিত্রকে মেপে নিতে চায়।

কিন্তু চোখ যে মাপবে সে সাধ্য তার নেই। প্রায় তিনমাইল লম্বা ও এক মাইল চওড়া আগরের এই পুকুরের আগৌর একশো কুড়ি বর্গমাইল পরিমাণ জমিতে বিস্তৃত। এটি জয়সলমেরের মহারাজা মহারাওল ঘড়সি তেরোশো একানব্বই বিক্রম সংবত অর্থাৎ তেরোশো পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দে তৈরি করিয়েছিলেন। অনান্য রাজারাও পুকুর তৈরি করিয়েছেন, কিন্তু ঘড়সি এতে নিজেও অংশগ্রহণ করেন। মহারাজা প্রতিদিন সুউচ্চ কেল্লা থেকে নেমে এসে খোঁড়া-খুঁড়ি, ভরাট-করা প্রভৃতি সব কাজই নিজে দেখাশোনা করতেন।

এই সময়টা ছিল জয়সলমের রাজবংশে উত্থান-পতনের কাল। ভাটি বংশে সিংহাসনের দখল নিয়ে ক্রমাগত অন্তর্কলহ, ষড়যন্ত্র ও সংঘর্ষ চলছিল। একদিকে মামা নিজের ভাগ্নের ওপর আঘাত হানছে, অন্যদিকে কেউ নিজের ভাইকে দেশের বাইরে নির্বাসন দিচ্ছে আবার কোথাও কেউ কারো খাবারে বিষ মেশাচ্ছে। একদিকে রাজবংশের এই অন্তর্কলহ তো ছিলই, তার ওপর রাজ্য ও শহর জয়সলমেরও সেই সময় দেশী-বিদেশী আক্রমণকারীরা ঘিরে ফেলছিল যখন-তখন। পুরুষেরা বীরের

মতো মৃত্যু বরণ করছিল আর স্ত্রীরা নিজেদের উৎসর্গ করছিল জহরব্রতের আগুনে। এই রকম এক জ্বলন্ত সময়ে ঘড়সি নিজে রাঠোরদের সেনার সাহায্য নিয়ে জয়সলমের অধিকার করেন। ইতিহাস বইতে ঘড়সির সময়কাল 'জয়-পরাজয়', 'বৈভব-পরাভব', 'মৃত্যুর ঘাট' ও 'সমর-সাগর' জাতীয় শব্দে ভর্তি।

অথচ তখনও সেই সাগর তৈরি হচ্ছিল। দীর্ঘ সময়ের এই পরিকল্পনায় কাজ কারার জন্য ঘড়সি অশেষ ধৈর্যে প্রয়োজনীয় সব উপাদান জড়ো করেছিলেন। এজন্য তাঁকে চরম মূল্যই দিতে হয়েছিল। পাড় তৈরি হচ্ছে, মহারাজ সেখানে দাঁড়িয়ে সমস্ত কাজ দেখাশোনা করছেন; এমন সময় প্রাসাদের ষড়যন্ত্রে পাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা ঘড়সির ওপর প্রাণঘাতী আক্রমণ নেমে আসে। সে সময় মৃত রাজার চিতায় রানির সতী হওয়ার প্রচলন ছিল। কিন্তু রাণি বিমলা সতী হননি। তিনি রাজার স্বপ্ন পূর্ণ করলেন।

বালির এই স্বপ্নের দুটো রঙ। নীল রঙ জলের, আর তিন-চার মাইল এলাকা নিয়ে পরিধির প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে যে ঘাট, মন্দির, মিনার ও বারান্দার সারি, তার রঙ হলুদ। কিন্তু এই স্বপ্ন দিনে দুবার কেবল একটিমাত্র রঙেই রঙিন হয়ে ওঠে। উদীয়মান ও অস্তগামী সূর্য এই সময় ঘড়সিসরের জলে যেন মন-ভর সোনা গলিয়ে ঢেলে দেয়। 'মন' বলতে মাপ-জোক করার 'মণ' নয়, যতটা হলে সূর্যের মন ভরে যায় ঠিক ততটাই।

মানুষও নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী ঘড়সিসরে সোনা ঢেলেছিল। পুকুর রাজার হলেও প্রজাই তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করতে থাকে। প্রথম দফায় তৈরি হয় মন্দির, ঘাট এবং জলমহল বেড়েই চলে। যার যখন যা কিছু ভালো মনে হয়েছে, তা-ই সে ঘড়সিসরের জন্য উৎসর্গ করেছে। এই ভাবে রাজা প্রজার যুগলবন্দিতে ঘড়সিসর অপূর্ব এক গান হয়ে ওঠে। একসময় ঘাটের ওপর পাঠশালাও করা হয়েছিল। এখানে শহর ও আশেপাশের গ্রামের ছাত্ররা এসে থাকত এবং সেখানেই গুরুর কাছে জ্ঞানলাভ করত। পাড়ের একপাশে ছিল রান্না ও থাকার জন্য ছোট ছোট ঘর। দরবার অথবা কাছারিতে যদি কারো কাজ আটকে যেত, তাহলে সে গ্রাম থেকে এসে এখানেই আশ্রয় নিত। নীলকণ্ঠ ও গিরিধারীর মন্দির,যজ্ঞশালা, জামালশাহ পিরের চৌকি সব কিছু একই ঘাটে।

জীবিকার জন্য মরুভূমি ছেড়ে দেশের অন্য কোথাও প্রবাসী হয়েছে এমন পরিবারগুলিরও মন পড়ে থাকত ঘড়সিসরে। এ রকমই, মধ্যপ্রদেশের জববলপুরে চলে গিয়েছিলেন শেঠ গোবিন্দ দাসের পূর্বসূরীরা। পরে তাঁরা এখানে ফিরে ঘাটের

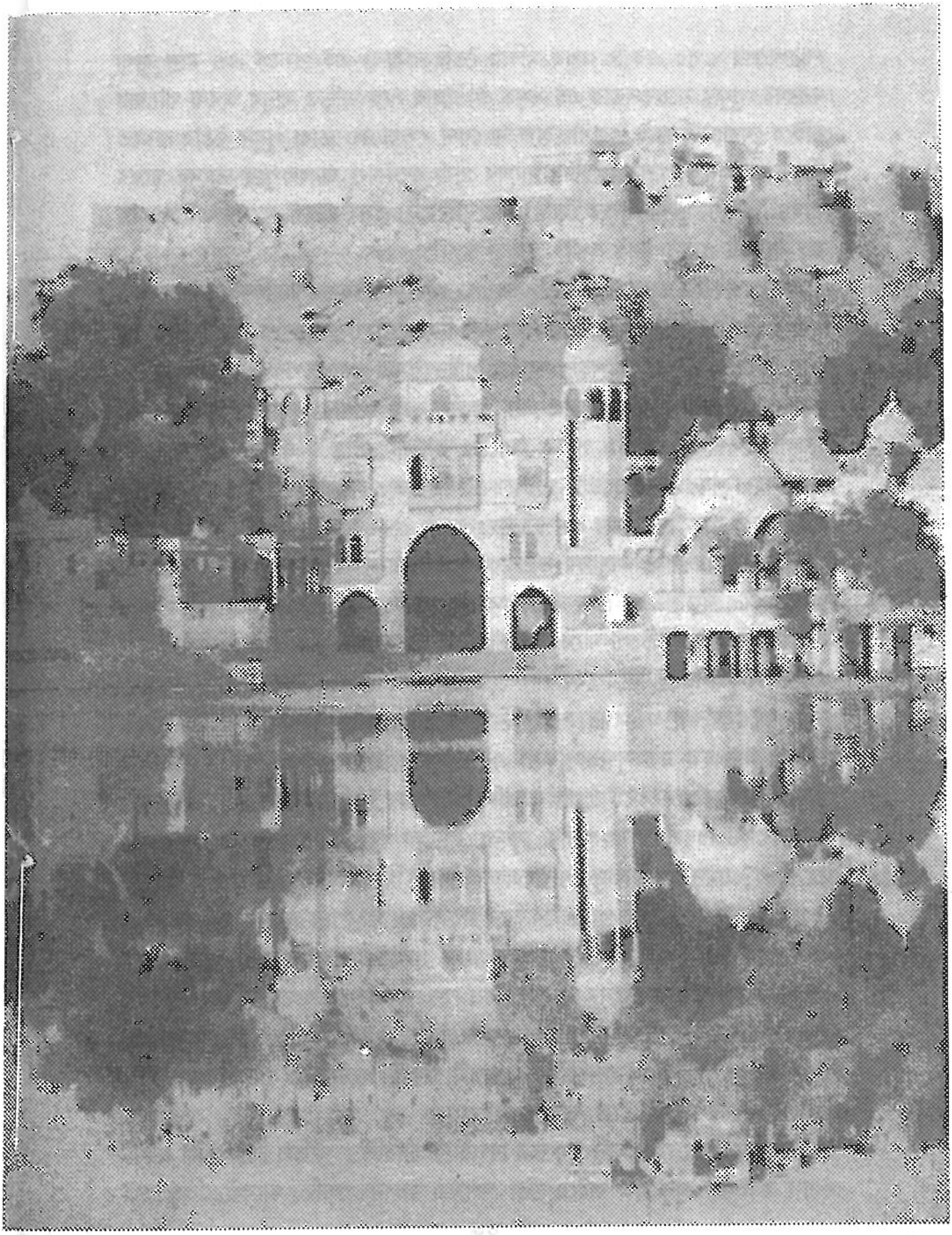

পাঠশালের ওপর একটি অপূর্ব মন্দির তৈরি করান। এই প্রসঙ্গে এও মনে রাখা দরকার, পুকুর সচেতনতার এই সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত মানুষ অথবা পরিবার বাইরে যেখানে গিয়েই প্রবাসী হোক না কেন, সেখানেও তারা পুকুর তৈরি করতে বিরত থাকেননি। শেঠ গোবিন্দ দাশের পূর্বপুরুষেরাও জব্বলপুরে তাদের ঘরের সামনে একটি সুন্দর পুকুর তৈরি করিয়েছিলেন। হনুমানতাল নামের এই পুকুরে ঘড়সিসরের প্রভাব খুবই স্পষ্ট।

সারা শহরের জল যেত ঘড়সিসর থেকেই। সাধারণত সারাদিনই এখানে জল ভরা চলত কিন্তু সকাল ও সন্ধ্যেবেলা জল নিতে আসা কয়েকশো মেয়েদের ভিড়ে যেন মেলা লাগে যেত। শহরে পাইপ লাইন বসার আগে পর্যন্ত এই দৃশ্য দেখা গেছে। উম্মেদসিংজি মেহেতার এক গজলে এই দৃশ্যের সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। গজলটি লেখা হয় ১৯১৯ সালে। 'ভাদ্রের কাজলী', তীজ[২] -এ যখন মেলা বসত, তখন সারা শহর সেজেগুজে ঘড়সিসরে উপস্থিত হত। শুধুমাত্র নীল ও হলুদ রঙের এই পুকুরে প্রকৃতির সমস্ত রঙ ছড়িয়ে পড়ত।

ঘড়সিসরের প্রতি মানুষের ভালোবাসা একতরফা ছিল না। মানুষ ঘড়সিসরে আসত আর ঘড়সিসরও যেন তাদের কাছে পৌঁছে মনে জায়গা করে নিত। সুদূর সিন্ধুপ্রদেশে প্রবাসী টিলোঁ নামে এক গণিকার মন সম্ভবত এই রকমই কোনো এক মুহূর্তে কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে।

পুকুরে মন্দির ঘাট-পাট সবই ছিল। জাঁকজমকেরও অভাব ছিল না। তবুও টিলোঁর মনে হয় এত সুন্দর পুকুরে একটা সুন্দর প্রবেশদ্বারও থাকা দরকার। সে ঘড়সিসরের পশ্চিম ঘাটে 'পোল' অর্থাৎ প্রবেশদ্বার তৈরি করানোর সিদ্ধান্ত নেয়। পাথরের ওপর সূক্ষ্ম নকশাদার, সুন্দর জানালা দেওয়া প্রবেশদ্বার শেষ হয়েই এসেছিল; এমন সময় কিছু লোক রাজার কাছে গিয়ে কানভাঙানি দেয় : 'আপনি শেষে এক গণিকার তৈরি প্রবেশদ্বার দিয়ে ঘড়সিসরে প্রবেশ করবেন, ফলে বাদানুবাদ শুরু হয়ে যায়। ওদিকে প্রবেশদ্বারের কাজ চলছে। একদিন রাজা এটি ভেঙে ফেলবেন বলেই সিদ্ধান্ত নেন। টিলোঁ খবর পায়। অমনি সে রাতারাতি প্রবেশদ্বারের সবচেয়ে উঁচু তলায় মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়ে দেয়। মহারাজা মত বদলান। তখন থেকেই সারা শহর এই সুন্দর প্রবেশদ্বারটি দিয়েই ঘড়সিসরে প্রবেশ করে এবং টিলোঁর নামের সঙ্গেই একে স্মরণে রেখেছে।

এই প্রবেশদ্বারের সামনে পুকুরের বিপরীতে চারিদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটি গোল জায়গা। পুকুরের বাইরে তো আমের বাগান প্রভৃতি থাকেই, কিন্তু এই

পুকুরের ভিতরেই গোল জায়গাটি হল বাগান। এখানে মানুষ 'গোঠ' অর্থাৎ আনন্দ-মঙ্গল করতে আসে। এর সঙ্গেই পূর্বদিকে চারদিক ঘেরা আরো বড় একটা গোল জায়গা ছিল। সেখানে থাকত পুকুর-রক্ষাকারী ফৌজ। দেশী-বিদেশী শত্রুতে বেষ্টিত রাজ্যের মানুষকে জলপ্রদানকারী একমাত্র পুকুরের সুরক্ষা ব্যবস্থা তো পাকা হবেই।

মরুভূমিতে বৃষ্টি যতই কম হোক, ঘড়সিসরের আগৌর এত বড় ছিল যে সেখানকার প্রতিটি জলের ফোঁটা গড়িয়ে পুকুরে এসে তাকে কানায় কানায় ভরিয়ে তুলত। ঘড়সিসরের সামনে পাহাড়ের ওপর তৈরি দুর্গের ওপর উঠে সামগ্রিকভাবে দেখে, অথবা নীচে আগৌরের মধ্যে পায়ে হেঁটে ঘুরে, যেভাবেই হোক, বারবার বোঝালেও এই বিশাল পুকুরে কিভাবে জল সংগ্রহ করা হত সে পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, সহজে বুঝে ওঠা শক্ত। দিগন্ত থেকে বাহিত হয়ে আসত এর সঞ্চয়। এই বিশাল এলাকার জল একসঙ্গে জড়ো করে পুকুরের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসার জন্য প্রায় আট কিলোমিটার লম্বা জমি এক পাশে বাঁধিয়ে নিয়ে 'আড়' তৈরি করা হয়। এরপর বিশাল মাত্রায় বয়ে আসা জলের শক্তি পরীক্ষা করে দেখা হয় এবং এর আঘাত প্রতিরোধ করতে সেই বাঁধানো জমির পাশে লম্বা ও মজবুত পাথরের চাদর অর্থাৎ প্রাচীর তৈরি হয়। এতে ধাক্কা খেয়ে জল তার সমস্ত গতি হারিয়ে ধীরে ধীরে ঘড়সিসরে প্রবেশ করে। এই প্রাচীরটা না থাকলে ঘড়সিসরের আগর, তার সুন্দর ঘাট ও অন্য সব অঙ্গও ধ্বসে যেতে পারত।

এবার কানায় কানায় ভরে ওঠা ঘড়সিসরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব 'নেষ্টা'র হাতে চলে যেত। পুকুরের অতিরিক্ত জল পাড়ের কোনো ক্ষতি না করেই যে অংশ দিয়ে বাইরে চলে যেতে পারে— তারই নাম নেষ্টা। এটি বইতে শুরু করত এবং এই বিশাল পুকুরকে ভেঙে ফেলতে পারে যে অতিরিক্ত জল, তাকে বাইরে নিয়ে যেত। কিন্তু, এই 'বয়ে যাওয়া'-'টিও ছিল বড়ই বিচিত্র। যারা বা যেসব মানুষ এক একটি জলবিন্দু সংগ্রহ করে ঘড়সিসরকে ভরাতে জানত তারা সেই অতিরিক্ত জলটুকুকে শুধুমাত্র জল নয় অপার জলরাশি হিসেবেই ভাবত। নেষ্টায় প্রবাহিত জল সামনে একদিকে অন্য একটা পুকুরে জমা করে নেওয়া হত। 'নেষ্টা' তখনও বইতে থাকলে, সেই জল গিয়ে জমা হত দ্বিতীয় আরেকটা পুকুরে। এই ধারাবাহিকতা পুরো নয়টি পুকুর পর্যন্ত চলত। নৌতাল, গোবিন্দসর, জোশিসর, গোপালসর, ভাটিয়াসর, সুদাসর, মোহ্তাসর, রতনসর এবং কিষণঘাট। এখানে পৌঁছেও যদি জল বেঁচে যেত, তাহলে কিষানঘাটের পর তাকে কিছু 'বেরি' অর্থাৎ ছোট ছোট কুয়োর মতো কুণ্ডে ভরে রাখা হত। জলের প্রতিটি বিন্দু আক্ষরিক অর্থেই ঘড়সিসর

থেকে কিষাণঘাট— প্রায় সাত মাইল দীর্ঘ রাস্তায় নিজের সঠিক অর্থ পেয়ে যেত।

আজ যাদের হাতে জয়সলমেরের প্রশাসন, তারা ঘড়সিসরের তাৎপর্যই ভুলে গেছে, তো তার নেষ্টার সঙ্গে যুক্ত বাকি নয় পুকুরের বিষয়ে তাদের সচেতনতা কী করে থাকবে। ঘড়সিসরের আগৌরে এখন বায়ুসেনার বিমানঘাঁটি। তাই, আগৌরের এই অংশের জল এখন পুকুরের দিকে না এসে অন্য কোথাও বয়ে যায়। নেষ্টা ও তার রাস্তায় পড়ে যে নয়টি পুকুর, তার আশপাশেও আজ দ্রুতগতিতে বাড়িঘর, নতুন নতুন গৃহনির্মাণ সংস্থার ফ্ল্যাট, এমনকী জল সমস্যা নিয়ে যারা কাজ করছে, সেই ইন্দিরা নহর প্রাধিকরণের অফিস ও তার কর্মীদের আবাসন গড়ে উঠেছে। ঘাট, পাটশালাসমূহ, রান্নাঘর, বারান্দা, মন্দির— প্রভৃতি সবকিছুই যথার্থ দেখাশোনার অভাবে আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আজ শহর আর সেই 'ল্হাস' খেলে না, যাতে রাজা প্রজা সকলে মিলে ঘড়সিসরকে পরিষ্কার করত, পাঁক বের করত। পুকুরের ধারে স্থাপিত পাথরের জলস্তম্ভও কিছুটা নড়বড়ে হয়ে একদিকে হেলে পড়েছে। পুকুরের রক্ষীবাহিনী যে অংশে থাকত, সেখানকার গম্বুজের পাথরও আজ নড়বড়ে হয়ে পড়েছে।

ঘাটের বারান্দা কোথাও কোথাও এখন বেদখল হয়ে গেছে। যেসব পাঠশালায় একদিন ঐতিহ্য সম্পন্ন জ্ঞানের প্রকাশ ঘটত, সেখানে আজ আবর্জনার স্তূপ। গত কয়েক বছর ধরেই জয়সলমের, বিশ্ব-পর্যটন মানচিত্রে স্থান পেয়েছে। শীতের সময়, নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এখন সারা পৃথিবী থেকে ভ্রমণ পিপাসু মানুষেরা এসে এখানে জড়ো হয়। তাদের কাছে সুন্দর এই পুকুর বিশাল আকর্ষণের। এজন্যই গত দু'বছর আগে সরকার ঘড়সিসরের দিকে কিছুটা মনোযোগ দেয়। আগৌর থেকে আসা জল আজ আর পর্যাপ্ত নয় বলে, ঘাটতিটুকু ইন্দিরা গান্ধী নহর থেকে পাইপে করে এনে পূরণ করার চেষ্টা করা হয়। যথেষ্ট ভালভাবে প্রকল্পটির উদ্বোধন হয়েছিল; কিন্তু প্রথমবার জল নিয়ে আসার পরই অনেকদূর থেকে টেনে আনা পাইপলাইনে ফাটল ধরে, এখন সেটি সম্পূর্ণ অকেজো। ওটি আর সারানো যায়নি। ঘড়সিসর আজও, যতটা সম্ভব বর্ষার জলেই ভরে ওঠে।

ছশো আটষট্টি বছরের ঘড়সিসর শেষ হয়ে যায়নি। যাঁরা এই পুকুরটি তৈরি করেছিলেন, তাঁরা একে সময়ের প্রহার সহ্য করার মতো মজবুত করেই তৈরি করেছিলেন। বালির ঝড়ের মাঝে নিজেদের এই পুকুরকে অপূর্ব কৌশলে রক্ষা করার ঐতিহ্য ছিল যাদের, বোধহয় তারা ভাবতেই পারেননি যে উপেক্ষা অবহেলার ঝড়ও এর ওপর দিয়ে বইতে পারে। কিন্তু এই ঝড়কেও আজ ঘড়সিসর স্বয়ং,

এবং তাকে যারা বাঁচিয়ে রাখতে চায়, তেমন কিছু মানুষ ধৈর্য ধরে সহ্য করে চলেছে। পুকুর পাহারা দেওয়ার ফৌজ হয়তো এখন আর নেই, কিন্তু কিছু মানুষের সচেতন মনের পাহারা আজও আছে। দিনের প্রথম কিরণ এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে ঘণ্টা বেজে ওঠে। সারাদিন ধরেই ঘাটে মানুষের আনাগোনা। কিছু মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা মৌন হয়ে বসে ঘড়সিসরের সৌন্দর্য দেখতে থাকে, কেউ গান গায় অথবা কেউ হয়তো 'রাবনহথা' নামে বিশেষ এক ধরনের সারেঙ্গি বাজায়। ঘড়সিসরের অনেক দূরে উটের দল নিয়ে বালিয়াড়ির পর বালিয়াড়ি পার হয়ে চলেছে যারা, তারা আজও এর শীতল প্রাণদায়ী জলের গুণকীর্তন করে। জল নিতে আজও মেয়েরা ঘাটে আসে। উটের গাড়িতে জল যায়। এখন দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার সেখানে ট্যাঙ্কারও দেখা যাচ্ছে। ঘড়সিসর থেকে জল নিতে এরা ডিজেল পাম্প পর্যন্ত চালায়!

ঘড়সিসর আজও জল দিয়ে চলেছে। সেইজন্যই বুঝি উদীয়মান ও অস্তগামী সূর্য আজও তার জলে মন-ভর সোনা ঢেলে দিয়ে যায়।

ঘড়সিসর একটা দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছিল। তাই এর পর আর কোনো নতুন পুকুর করা হয়তো কঠিন ছিল। তবুও জয়সলমের অঞ্চলে প্রতি পঞ্চাশ একশো বছর অন্তর পুকুর তৈরি হতেই থাকে এক সে এক, মানিক ঘড়সিসরের সঙ্গে যেন গেঁথে চলা এক একটি মুক্তা।

ঘড়সিসরের প্রায় একশো পঁচাত্তর বছর পর তৈরি হয় জৈতসর। এটা একটা বাঁধ, তবে সংলগ্ন বড় বাগানের জন্য একে 'বড়াবাগ' হিসেবেই স্মরণ করা হয়ে থাকে। এই পাথরের বাঁধ জয়সলমেরের উত্তরে খাড়া পাহাড় থেকে নেমে আসা সমস্ত জল আটকে রেখেছে। একদিকে জৈতসর, আর অন্যদিকে রয়েছে তার জল থেকেই সিঞ্চিত 'বড়াবাগ'। এ দুটিকে পৃথক করেছে বাঁধের দেওয়াল। কিন্তু এ যেন দেওয়াল নয়, বড়সড় চওড়া রাস্তাই মনে হয়, যা মূল জলাধার পার হয়ে সামনের পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। দেওয়ালের নীচে সেচ খালটির নাম 'রামনাল'। রামনাল নহর বাঁধের দিকটায় সিঁড়ির মতন। জৈতসরের জলের স্তর বেশি বা কম যাই হোক, নহরের এই সিঁড়ির মতন গঠন জলকে বড়াবাগের দিকে নামিয়ে নিয়ে যায়। সেখানে পৌঁছে রামনাল রামের নামের মতোই প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। নহরের প্রথম কোণাতেই একটা কুয়োও আছে। জল শুকিয়ে গেলে অথবা, নহর বন্ধ হয়ে গেলে চুঁইয়ে আসা ভৌমজলে ভর্তি এই কুয়ো কাজে লাগে। এই বড় কুয়োটিতে চড়স দিয়ে জল তোলা হয়। কখনও এটিতে 'রহট' ব্যবহার হত। আর

বড়াবাগে ছোট ছোট অগুণতি কুয়োও রয়েছে।

বড়াবাগ সত্যি করেই সুবিশাল এবং সবুজে সবুজ। উঁচু আর বিরাট আমের বাগান, বাগানে বিভিন্ন ধরনের গাছপালা। বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে সাধারণত নদীর ধারে যে অর্জুন গাছ দেখা যায়, তাও পাওয়া যাবে এই বড়াবাগে। সূর্যের কিরণ এখানে গাছের পাতায় বাধা পেয়ে আটকে যায়, হাওয়া দিলে পাতা নড়ে, তখন ফাঁক পেয়ে ছেঁড়া ছেঁড়া সূর্যালোক উপচে পড়ে মাটিতে। বাগানের অন্যপাশে, পাহাড়ে রাজবংশের শ্মশান। সেখানে স্বর্গত ব্যাক্তিদের স্মৃতিতে প্রচুর সুন্দর সুন্দর 'ছত্রী' করানো হয়েছে।

অমরসাগর তৈরি হয় ঘড়সিসরের তিনশো পঁচিশ বছর পর। বয়ে যাওয়া জলকে আটক করা প্রধান উদ্দেশ্য হলেও, অমর সাগর যারা তৈরি করেছিলেন তারা সম্ভবত এটাও জানাতে চেয়েছিলেন যে উপযোগী আর সুন্দর পুকুর তৈরি করার ইচ্ছেটাই আসলে অমর। পাথরের টুকরো জুড়ে জুড়ে যে কী অদ্ভুত সুন্দর পুকুর তৈরি করা যেতে পারে, তার উদাহরণ হিসেবে অমরসাগরের জুড়ি নেই! পুকুরের চারটি পাড়ের মধ্যে একটি পাড় খাড়া এবং উঁচু একটা দেওয়াল হিসেবেই গড়ে তোলা হয়েছে। দেওয়ালের সঙ্গে মিনার ও জানালা ছুঁয়ে ধাপে ধাপে সিঁড়ি নীচে পুকুর পর্যন্ত নেমে গেছে। এই দেওয়ালেরই সমতল অংশে আলাদা আলাদা উচ্চতায় পাথরের বাঘ, হাতি, ঘোড়া প্রভৃতি খোদিত। পাথরের এই সুন্দর মূর্তিগুলি আসলে জলস্তর নির্দেশক। গোটা শহর এগুলি দেখে অতি সহজেই বুঝে নিত জল কতটা এসেছে আর তাতে কত মাস চলতে পারে।

অমর সাগরের আগৌর তত বড় নয় যে তা থেকে সারা বছরের জল পাওয়া যাবে। গরম পড়তে না পড়তেই অমর সাগর শুকিয়ে আসতে থাকে। এর মানে দাঁড়ায়, যখন সবচেয়ে বেশি জলের প্রয়োজন, জয়সলমেরের মানুষ এই অপূর্ব পুকুরটিকে তখনই ভুলে যায়? আশ্চর্য হতে হয়! এখানকার বাস্তুকার শিল্পীরা এমন কিছু কৃতিত্ব এক্ষেত্রে দেখিয়েছেন, যা স্থাপত্যশিল্পের শাস্ত্রীয় গ্রন্থে অনায়াসে নতুন কয়েকটি পাতা যোগ করতে পারে।পুকুরটির নীচে মেঝেতে সাতটা 'বেরি' তৈরি করা হয়েছিল। বেরি এক বিশেষ ধরনের বাউড়ি। এর আর এক নাম 'পগবাও'। পগবাও শব্দ এসেছে পগবাহ থেকে। বাহ, বায় বা বাউড়ি। পগবাও অর্থাৎ পা-পা হেঁটেই যেখানে জল পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। পুকুরের জল শুকিয়ে গেলেও বাউড়িগুলির চুয়ানো জলে জলস্তর উঠেই থাকে চুঁইয়ে আসা ভৌমজলে সেগুলি তখনও পরিপূর্ণ। এই বাউড়িগুলো আবার এমন ভাবে তৈরি, যাতে গ্রীষ্মে জল হারিয়ে ফেলা অমর

সাগর তার নিজের সৌন্দর্য না হারিয়ে ফেলে। সমস্ত বাউড়িগুলোতে পাথরের সুন্দর চাতাল, স্তম্ভ, ছত্র এবং নীচে নামার জন্য শৈল্পিক কারুকার্যময় সিঁড়ি। গরমে বৈশাখে যেমন মেলা বসত, সেইরকম বর্ষার ভাদ্রেও। শুকনো অমর সাগরের বাউড়িগুলো যেন এক বিশাল মহলের একাংশের মতো লাগে। আর যখন অমর সাগর ভরে ওঠে, তখন মনে হয় পুকুরে ছাতাওয়ালা নৌকো ভাসছে।

মরুভূমিতে জয়সলমের এমন একটা রাজ্য, এক সময় বাণিজ্যে যার জয়ডঙ্কা শোনা যায়। তখন শয়ে শয়ে উটের ক্যারাভান প্রতিদিন এখানে থেমেছে। আজকের সিন্ধু প্রদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্থান, ইরান, ইরাক, আফ্রিকা এমনকী সুদুর কাজকেস্তান, উজবেকিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকেও পণ্যদ্রব্য এখানকার বাজারে আসত। আজ এখানকার মানক চক-এ হয়তো শুধু শাক-সবজি বিক্রি হয়, অথচ এমন একদিন ছিল, যখন এখানেই কেনাবেচা হত মণিমাণিক্য। যারা উটের ভিড় সামলাতো, তারা এখানে লক্ষ লক্ষ টাকার মালপত্র নামাতে সাহায্য করেছে সেসময়। আঠারোশো সালের সূচনা পর্যন্ত জয়সলমেরের এই সমৃদ্ধি অটুট ছিল। তখন এখানে পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষের বাস। আজ সেই সংখ্যা কমতে কমতে প্রায় অর্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছে।

যখন মন্দার সময় এল, তখনও জয়সলমের অঞ্চলে পুকুর তৈরিতে মন্দা পড়েনি। গজরূপসাগর, মূলসাগর, গঙ্গাসাগর, ডেডাসর, গোলাপপুকুর, ইসরালালজির পুকুর এই ভাবে একের পর এক পুকুর তৈরি হয়ে চলেছিল। জয়সলমের শহরে আজও এত পুকুর আছে যে, তাদের ঠিকঠাক গুণে ওঠা এক কঠিন কাজ। সম্পূর্ণ বলে ধরে নেওয়া তালিকায় যেকোন সাধারণ লোক চলতে-ফিরতে দুটো-চারটে নতুন নাম যোগ করে দিয়ে কৌতুকে হেসে ফেলে।

ঐতিহ্যের এই সুশৃঙ্খল ধারা ইংরেজরা আসার আগে পর্যন্ত ভেঙে পড়েনি। শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব শুধু রাজা-জমিদার, রাণা অথবা মহারাণাদের ওপরই ন্যস্ত ছিল না। আজকের পরিভাষায় সমাজে যাদের আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তারাও দীর্ঘদিন পুকুরের এই শৃঙ্খলা রক্ষায় অংশ নিয়েছে।

মেঘা পশু চরাত, গল্পটা পাঁচশো বছরের পুরোনো। পশুর পাল নিয়ে সে ভোরবেলাতেই বেরিয়ে পড়ত। ক্রোশের পর ক্রোশ ছড়িয়ে থাকা মরুভূমি। সারাদিনের জন্য তাই এক কোপড়ি জল সঙ্গে নিত। ঘরে ফিরতে সন্ধে। একদিন কোপড়ির জল কী কারণে যেন খানিকটা বেঁচে গেল। মেঘা কী জানি কী ভাবল, একটা ছোট্ট গর্ত খুঁড়ে তাতে জলটুকু ঢেলে দিয়ে ভালোভাবে আকন্দপাতায় ঢেকে দিল।

চরানোর কাজ আজ এখানে তো কাল অন্যত্র। মেঘা পরের দুদিন আর সেখানে

যেতে পারল না। তৃতীয় দিন সেখানে পৌঁছেই অসীম কৌতূহলে পাতা সরালো। গর্তে জল অবশ্যই ছিল না, কিন্তু ঠান্ডা হাওয়ার একটা স্পর্শ পাওয়া গেল। মেঘার মুখ থেকে আপনা-আপনি শব্দ বেরিয়ে এল— 'ভাপ'; সে ভাবল এত গরমেও যদি এখানে ওইটুকু জলের আর্দ্রতা টিকে থাকে, তাহলে এখানে পুকুরও হতে পারে।

মেঘা একলাই পুকুর খুঁড়তে শুরু করে। এখন সে প্রতিদিন কোদাল ও কড়াই সঙ্গে নিয়ে যায়। সারাদিন একাই মাটি কাটে, পাড়ে ফেলে। গরুগুলো আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। ভীমের মত শক্তি তার ছিল না ঠিকই, কিন্তু সংকল্প তার ভীষ্মের মতোই কঠিন। দুবছর পর্যন্ত সে একাই কাজে লেগে থাকল। সীমাহীন মরুভূমির ভেতর এখন পাড়ের বিশাল ঘেরা দূর থেকেও দেখা যায়। পাড়ের খবর একদিন পাশের গ্রামগুলোতেও পৌঁছাল। এবার প্রতিদিন সকালে গ্রাম থেকে ছোটরা এবং কিছু অন্যান্য লোকজনও তার সঙ্গে যায়। সকলে মিলে কাজ করে। এই ভাবে বারো বছর হয়ে গেল, পুকুরের কাজ তখনও চলছে। এদিকে মেঘার সময় পূর্ণ হয়ে এল, মৃত্যু হল তার। তার স্ত্রী সতী হয়নি। মেঘার অসমাপ্ত পুকুরের কাজ সে নিজের কাঁধে তুলে নেয়। মেঘার বদলে এবার সে নিজেই পুকুরের কাজ করতে আসে। পরবর্তী ছ-মাসে পুকুর তৈরি সম্পূর্ন হয়।

জলের ভাপ দেখে পুকুর তৈরীর কাজ শুরু হয়েছিল তাই ঐ জায়গার নামও হয় ভাপ। পরে তা বিকৃত হয়ে 'বাপ' উচ্চারণে পরিণত হয়েছে। সামান্য 'চরাবহা' মেঘাকে জনসমাজ 'মেঘাজি' হিসেবে মনে রেখেছে এবং পুকুরের পাড়ে তার নামে সুন্দর একটি ছত্রী ও তার স্ত্রীর স্মৃতিতে ছোট একটি মন্দির নির্মাণ করেছে।

জয়সলমের-বিকানের রাস্তার ওপর ছোট্ট এক শহর বাপ। চা-কচুরির ছ-সাতটা দোকানওয়ালা একটা বাসস্ট্যান্ড, আর বাসের চেয়ে তিন গুণ উঁচু পাড় স্ট্যান্ডের পাশেই দাঁড়িয়ে। গরমকালে পাড়ের এপাশে লু বয়, ওপাশে মেঘাজি পুকুরে তখন ঢেউয়ের পর ঢেউ ভাঙে। বর্ষার সময় তো পুকুরে লাখেটা (দীপ) লাগানো হয়। তখন জলের বিস্তার চার মাইল ছড়িয়ে পড়ে। মেঘ ও মেঘের দেবতা মরুভূমিতে যদিও কমই আসেন, কিন্তু মেঘাজির মতো মানুষের অভাব কখনোই সেখানে হয়নি।

রাজস্থানের পুকুরের যশকীর্তন পূর্ণ হবে না যদি না জসেরি নামক এক পুকুরের কথা বলা হয়। জয়সলমের থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে ডড়া গ্রামের কাছে নির্মিত এই পুকুরটি জল সংগ্রহের ব্যাপারে যেন সমস্ত অসম্ভবের বেড়া অতিক্রম করে এক প্রবাদে পরিণত হয়েছে। চারিদিকে তপ্ত মরুভূমি, কিন্তু জসেরির জল কখনও শুকোয় না; তার খ্যাতিও থাকে অম্লান। বাবলা গাছ ও ঝোপঝাড়ে ঢাকা

পাড়ের ওপর একটা সুন্দর ছোট ঘাট এবং পুকুরের এক কোণায় পাথরের সুন্দর ছত্রী। বলার মতো কিংবা উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই এখানে নেই। তবুও বছরের যেকোন মাসেই দেখা যাবে নীল জলে ঢেউ ভাঙছে, চারিদিকে পাখিদের মেলা। জসেরির জল কখনো শুকোয় না। ভয়ংকব থেকে ভয়ংকরতম দুর্ভিক্ষেও জসেরির জলের যশ কখনো শুকায়নি ।

জসেরিকে পুকুর বলা যায়, আবার বড় এক 'কুঁই'-ও বলা যেতে পারে। এর আগরের ঠিক নীচে রয়েছে খড়িয়া পাথরের স্তর। পুকুরটি খোঁড়ার সময় খড়িয়া স্তরের যথেষ্ট খেয়াল রাখা হয়েছিল, কোথাও যেন কোনোভাবে ভেঙে না যায়। তাই এখানে পালর পানি ও রেজানি পানির এক অনবদ্য মেলবন্ধন ঘটেছে। গত বছরের বর্ষার জল শুকিয়ে যাবার আগেই এ বছরের বর্ষায় আবার নতুন জল এসে তার সঙ্গে মেশে। জসেরি যেন বৃষ্টি বিন্দুগুলির বাৎসরিক এক মহামিলন ক্ষেত্র।

শোনা যায়, পুকুরের মাঝখানে একটি 'পগবাও' অর্থাৎ বাউড়িও রয়েছে। পুকুর যারা তৈরি করেছিল, সেই পালিওয়াল ব্রাহ্মণ পরিবারের পক্ষ থেকে এই বাউড়ির পাশেই একটি তাম্রফলক লাগানো হয়। কিন্তু এই ফলকটি আজ পর্যন্ত কেউ দেখা বা পড়ার সুযোগ পায়নি। জসেরি যারা তৈরি করেছিল, তারা যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা করেই বোধহয় ফলকটি পুকুরের মাঝখানে বসায়। তাই তাম্রফলকের বদলে রুপোর মতো ঝকঝকে পুকুরেই মানুষের চোখ পড়ে আর তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

আশপাশের দু-চারটি গ্রাম নয়, সাতটি গ্রাম এই জসেরির থেকে জল নেয়। অনেক গ্রামের গবাদি পশুধনই এই জল ভাণ্ডারের সম্পন্নতার ওপর নির্ভরশীল। 'অন্নপূর্ণা'র মতোই জসেরিকে মানুষ 'জলপূর্ণা' বলে স্মরণ করে। এর খ্যাতির আরেকটা বড় দিক হল, অথৈ জলের সঙ্গে সে যেন মমতাতেও পরিপূর্ণ। আজ পর্যন্ত এই পুকুরে ডুবে কেউ মারা যয়নি। উটে বসে থাকা যাত্রীও এর মধ্যে ডুবে যেতে পারে জসেরি এতটাই গভীর; তবুও এখনো জসেরির নামের সঙ্গে কোন মৃত্যুর ঘটনা জড়িয়ে নেই। এ জন্য জসেরিকে 'নির্দোষ' বলা হয়।

জলের এরকম নির্দোষ ব্যবস্থা করতে পারে যে সমাজ, বিন্দুর ভিতরে সিন্ধুকে অনুভব করতে পারে যে সমাজ, সে সমাজের দিকে তাকিয়ে বিশ্ব বিস্মিত হয়ে পড়ে।

জল ও অন্নের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক

পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করলেন, 'সবচেয়ে বড় তপস্যা কী'? সহজ-সরল গোয়ালা উত্তর দেয়, 'আঁখ রো তো তপ ভলো।' চোখের তপস্যাই সবথেকে বড়। নিজের চারপাশের পৃথিবীটাকে ঠিকভাবে অনুভব করা, আর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে একটু একটু করে তৈরি হওয়া জীবনের প্রতি এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি-র সাধনাই ইহলোক থেকে পরলোক পর্যন্ত মানুষের বেঁচে থাকাটুকু সহজ ও সাবলীল করে দেয়। চোখের এই তপস্যা মরুভূমিতে জলের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার অন্ন জোগানোরও এক বিরল সাধনা করেছে। এই সাধনারই ফল 'খড়িন'।

লুনির মতো দু-একটা নদী বাদ দিলে মরুভূমিতে বারো মাসের নিত্যবহ নদী নেই বললেই চলে। মরুভূমির নদীগুলি কোনো একটা স্থানে জন্ম নেয়, কিছুটা পথ এগিয়ে যায়, তারপর আবার মরুভূমিতেই কোথায় যেন বিলীন হয়ে যায়। চোখের তপস্যা অবশ্য এই নদীগুলির প্রবাহ পথকেই পরম যত্নে পর্যবেক্ষণ করে এমন কয়েকটি স্থান খুঁজে নেয়, যেখানে তার জলধারাকে আটকে ফেলা সম্ভব।

এরকম সব জায়গাতেই তৈরি হয়েছে খড়িন। খড়িন হল এক ধরনের অস্থায়ী পুকুর। দুই দিকে মাটির পাড় তুলে তৃতীয় দিকে পাথরের মজবুত দেওয়াল অর্থাৎ চাদর তৈরী করে দেওয়া হয়। খড়িনের পাড়কে বলে 'ধোরা'। ধোরার দৈর্ঘ্য নির্ভর করে খড়িনে কতটা জল আসবে তার ওপর। কোনো কোনো খড়িন পাঁচ-সাত কিলোমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। বর্ষায় নদীর প্রবাহকে এই খড়িনে বেঁধে ফেলার পরও

যদি দেখা যায় আরও জল আসছে, তখন ঐ উদ্বৃত্ত জল পাথরের চাদর পেরিয়ে নির্দিষ্ট পথে দ্বিতীয়, এমনকী তৃতীয় খড়িনকে ভরিয়ে চলে। খড়িনে বিশ্রাম নিতে নিতে নদী ক্রমশ শুকিয়ে আসে। সঙ্গে খড়িনের মাটিও একটু একটু করে আর্দ্র হয়। মাটির ভেতর এই আর্দ্রতা ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং আর্দ্রতার ওপর ভরসা করেই খড়িনে গম প্রভৃতি বুনে দেওয়া হয়। মরুভূমিতে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়, তাতে এখানে গম ফলানো সম্ভব ছিল না। তবে কয়েকশো বছর আগে এখানে অনেক জায়গাতেই, বিশেষ করে জয়সলমেরে এত খড়িন তৈরি হয়েছিল যে, জেলার একটা অঞ্চলের পুরোনো নামই হয়ে যায় খড়িন।

খড়িন তৈরির কৃতিত্ব পালিওয়াল ব্রাহ্মণদের। কোন এক সময় এরা পালি অঞ্চল থেকে এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। পালিওয়ালদের কল্যাণেই জয়সলমের

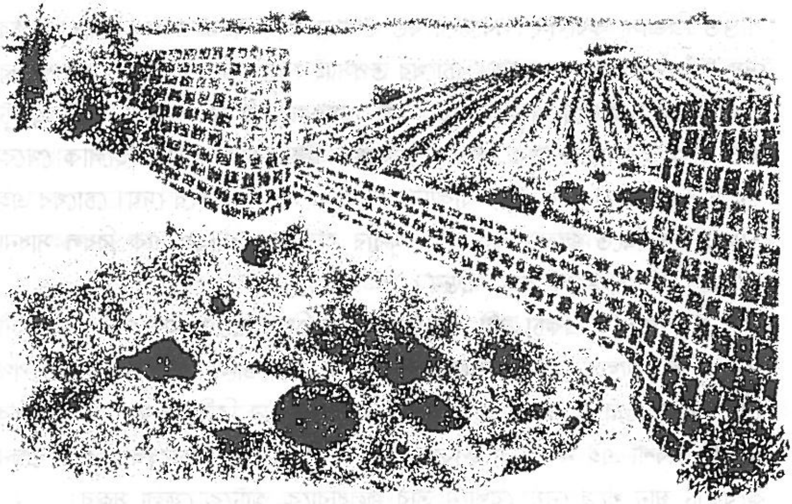

রাজ্য আনাজপত্রে ভরে ওঠে। এ অঞ্চলে পালিওয়ারা চুরাশিটি গ্রামে বসতি স্থাপন করে। প্রতিটি গ্রামই যথেষ্ট সুন্দর ও ব্যবস্থাসম্মত। লুডোর ছকের মত সাজানো ডাইনে-বাঁয়ে দীর্ঘ ও প্রশস্ত রাস্তাঘাট, পাথরের তৈরি সার সার সুন্দর ঘর, বসতি অঞ্চলের বাইরে পাঁচ-দশটা নাড়ি, দু-চারটে বড় বড় পুকুর এবং যতদূর চোখ যায়, আদিগন্ত দীর্ঘ খড়িনের ভেতর ঢেউ তোলা ফসল। গ্রামগুলিতে স্বাবলম্বন ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা এতটাই অনায়াস ছিল যে, দুর্ভিক্ষও এখানে এসে আনাজের তলায় চাপা পড়ে যেত।

এই স্বাবলম্বন গ্রামগুলিকে অহংকারী করেনি, তবে এতটাই আত্মসম্মান সচেতন করেছিল যে, কোনো এক সময় রাজার এক মন্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ বাঁধায় পুরো চুরাশিটি গ্রামের মানুষই গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। চুরাশিটি গ্রামের এক সম্মেলন হয় এবং সেখানে গৃহীত সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে বহু বছরের পরিশ্রমে তৈরী বাড়ি, ঘর, পুকুর, খড়িন, নাড়ি যেমন ছিল সেই অবস্থাতেই ফেলে রেখে সমস্ত গ্রাম খালি করে সকলে মিলে অন্য কোথাও চলে যায়।

সেই সময়কার তৈরি অধিকাংশ খড়িনগুলিতে এখনও গম চাষ হয়। ভালো বর্ষা হলে, অর্থাৎ যতটুকু বর্ষা জয়সলমেরে স্বাভাবিকভাবে হয়, সেটুকু হলেই খড়িনগুলি এক মন গমে পনের মণ ফিরিয়ে দেয়। প্রতিটি খড়িনের বাইরে পাথরের তৈরি রামকোঠা' পাওয়া যায়। এগুলিকে 'করাই'ও বলে। করাই-এর ব্যাস হয় পনেরো হাত এবং উচ্চতা দশ হাত। ঝাড়াই হওয়ার পর গম চলে যায় গমের জায়গায় আর খোসা-ভূসি প্রভৃতি জমা করা হয় এই করাইগুলিতে। একটা করাইয়ে একশো মণ পর্যন্ত ভুসি রাখা যায়। ভুসিকে এখানে বলে 'সুকলা'।

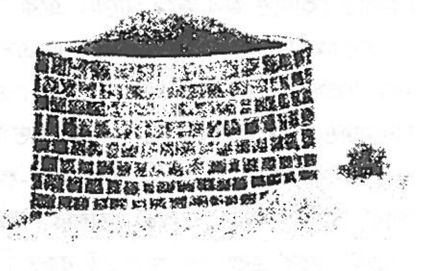

পুকুরের মতো খড়িনেরও নাম দেওয়া হয়। এমনকী পুকুরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো খড়িনেরও বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আলাদা আলাদা নাম রয়েছে। যেমন, 'ধোরা' হল পাড়। ধোরা আর পাথরের চাদরকে যুক্ত করে যে মজবুত বাঁধ, সেই অর্ধবৃত্তাকার অঙ্গটির নাম 'পাখা'। জলের বেগ কমিয়ে তার আঘাত ক্ষমতা

নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই এটি অর্ধবৃত্তাকার করা হয়। দুটি ধোরা, দুটি পাখা, একটি চাদর এবং অতিরিক্ত জল বাইরে বইয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য 'নেষ্টা' - সব কিছুই তৈরি করা হয় যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে। বারোমাস নিত্যবহ না হলেও চারমাসের অর্থাৎ বর্ষার নদীগুলিরও বেগ এমন প্রবল হয় যে,অল্প একটু অসাবধানতাই পুরো খড়িন ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

সমাজ বহু খড়িন তৈরি করেছে। তবে কিছু প্রাকৃতিক খড়িনও পাওয়া যায়। মরুভূমিতে এমন কিছু ভূমিরূপ আছে, যেখানে তিনদিক উঁচু হওয়ায় চতুর্থ দিক থেকে বয়ে আসা জল প্রাকৃতিকভাবেই আটকে পড়ে। একে বলে 'দেবীবাঁধ'। চলিত ভাষায় এটাই পরিণত হয়েছে 'দইবাঁধ'-এ, আর কোথাও কোথাও কোন এক নিয়মবশত একে 'দইবাঁধ জায়গা' বলা হতে থাকে।

খড়িন ও দইবাঁধের স্থান চারমাস জীবিত নদীগুলির জলে পুষ্ট হয়। আবার চলমান নদী এখানে ওখানে বাঁক নেয়। এই সব বাঁকে জলের আঘাতে মাটি ধুয়ে গিয়ে ছোট ছোট ডোবা তৈরি হয়, যেখানে নদী শুকিয়ে যাবার পরেও কিছু সময় পর্যন্ত জল জমে থাকে। এই জায়গাগুলিকে এখানে 'ভে' বলে। পরবর্তীকালে রেজানি পানি পাওয়ার জন্য এই ভেগুলি ব্যবহার করা হয়। খেতের নিচু অংশেও কোথাও কোথাও জল জমে থাকে। একে 'ডহর', 'ডহরি' বা 'ডৈর' বলা হয়।

এরকম ডহরের সংখ্যা কয়েকশো। এসব স্থানে 'পালর পানি' জমা হয়ে পরে ক্রমে 'রেজানি পানি'-তে রূপান্তরিত হয়। এর পরিমাণ কম হোক বা বেশি সেটা বিন্দুমাত্রও ভাবনার বিষয় নয়। বর্ষার রজত বিন্দু চার হাত পরিমাণ ডহরেই পাওয়া যাক অথবা চার মাইল ব্যাপী খড়িনে, দু-ক্ষেত্রেই তাকে সংগ্রহ করা হবে। 'কুঁই', 'পার', 'টাঁকা', 'নাড়ি', 'তলাই', 'তালাব', 'কুণ্ড', 'সরোবর', 'বেরে', 'খড়িন', 'দইবাঁধ জায়গা', 'ডহর' এবং 'ভে'-গুলি এই রজত বিন্দুতেই ভরে ওঠে। কিছু সময়ের জন্য হয়তো শুকিয়ে যায়, কিন্তু কখনই মরে না।

এ সবই চোখের তপস্যায় লিখিত জল ও অন্নের অমর বন্ধন, অমর কাহিনি।

‘ভুনের’ বারোমাস

গভীর কুয়োর দুই থামে আটকানো কাঠের চক্র অর্থাৎ ভুন বারো মাস ঘুরেই চলেছে। পাতালের ভৌমজল সে ওপরে তুলে আনে। মরুভূমিতে ভুনের কাজ বারোমাসই। আর ইন্দ্রের? ইন্দ্রের জন্য কেবল এক মুহূর্ত!

ভুন থারা বারে মাস
ইন্দর থারি এক ঘড়ি।

এ প্রবাদ ইন্দ্রের সম্মানে, নাকী ভুনেরই সম্মানে; সেকথা ঠিকঠাক বলা শক্ত। এর একটা অর্থ হতে পারে – বেচারা ভুন বারোমাস ঘুরে ঘুরে যে জল তোলে, ইন্দ্রদেব এক মুহূর্তে এক বারেই সেই পরিমাণ জল বর্ষণ করে থাকেন। দ্বিতীয় অর্থ এটাও হতে পারে, দেবরাজ ইন্দ্রের জন্যও মরুভূমিতে মাত্র একটি মুহূর্তই বরাদ্দ, অথচ ভুনের জন্য পুরো বারো মাস।

আসলে, এ প্রবাদ দুজনের কাউকেই ছোট করার জন্য নয়। বরং ইন্দ্রদেব এবং ভুন- অর্থাৎ ‘পালর পানি’ এবং ‘পাতাল পানি’— দুয়ের শাশ্বত সম্পর্কের কথাই এতে নিহিত। কেননা এক মুহূর্তে বৃষ্টির থেকে পাওয়া পালর পানি-ই তো আস্তে আস্তে চুঁইয়ে পাতাল পানিতে রূপান্তরিত হয়। দুই-ই আসলে জীবনেরই রূপ এবং উভয়েই তো প্রবাহমান। ভূপৃষ্ঠের ওপর বইতে থাকা পালর পানি চোখে দেখা যায়, কিন্তু মাটির গভীরে থাকা পাতাল পানি দেখা যায় না, এইটুকুই যা তফাৎ।

যে জল দেখা যায় না অর্থাৎ ভৌমজল, তাকেও অনুভব করার জন্য এক বিশেষ দৃষ্টি প্রয়োজন। কোথাও কোথাও পাতালের গভীরে থাকা জলের আরেক নাম ‘সির’, আর যারা তাকে ‘দেখতে’ পায়, তাদের বলা হয় ‘সিরবি’ কিন্তু শুধুমাত্র ঐ ভৌমজল অনুভব করার ক্ষমতাটুকুই যথেষ্ট নয়। তার প্রতি সমাজের এক বিশেষ দৃষ্টিকোণও খুবই জরুরি। এই মূল্যবোধটাই ভূগর্ভের ঐ জল অনুভব, অনুসন্ধান, উত্তোলন ও বিতরণের পেছনে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে থাকে; আর তার থেকেও বড় কথা, একবার ঐ জলের উৎস ও উত্তোলন অধিগত হওয়ার পর তা হারিয়ে না ফেলার

সচেতনতাও সে তৈরি করে দেয়।

সারা দেশ জুড়েই তো কুয়ো আছে কিন্তু রাজস্থানের অনেক জায়গাতেই বিশেষ করে মরুভূমিতে কুয়োর অর্থ সত্যিসত্যিই যেন পাতালপ্রবেশ। রাজস্থানে যেখানে বর্ষা বেশি, সেখানে ভৌমজল কিছুটা ওপরে যেখানে বর্ষা রীতিমতো কম, সেসব জায়গায় সমানুপাতিক হারে ভৌমজলের গভীরতাও বেড়ে যেতে থাকে।

মরুভূমিতে এর গভীরতা সাধারণত একশো থেকে একশো ত্রিশ মিটার অর্থাৎ তিনশো থেকে চারশো ফিট পর্যন্ত। মরুভূমির জনসমাজ এই গভীরতাকে নিজেদের হাতে এবং খুবই আত্মিকভাবে মেপে থাকে। মাপের একটি নাম 'পুরুষ' বা 'পুরুখ'। একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ভূমির সমান্তরালে দুই হাত ছড়িয়ে ধরলে যতটা লম্বা হয়, তা হল এক পুরুষ। মাপটা সাধারণভাবে ছয় ফিট বা তার কাছাকাছি। বেশ ভাল গভীর কুয়ো ষাট পুরুষ পর্যন্ত নামে। তবে সরাসরি ষাট পুরুষ না বলে, ভালোবেসে একে 'ষাঠি' বলা হয়।

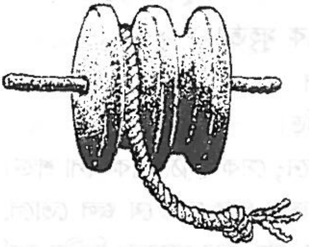

এত গভীর কুয়ো দেশের অন্য কোন জায়গায় দেখা যায় না। অবশ্য তার দরকারও পড়ে না। তবুও যদি আমরা খুঁড়তে চাইও, তাহলেও সাধারণ নিয়মে তা সম্ভব হবে না। এত গভীর কুয়ো কাটতে গেলে মাটির ধ্বস আটকানো খুব সহজ কাজ নয়; যথেষ্ট কঠিন এ কাজ। তাহলে রাজস্থানে যাঁরা জলের কাজ করেন তাঁরা এই কঠিন কাজকে কী সহজ করে ভাবতে শিখেছেন— ব্যাপারটা এমন নয়। আসল কথাটা হল, কঠিন কাজটাই কীভাবে সহজভাবে করা যায় সে উপায়গুলো তাঁরা খুঁজে বের করেছেন।

'কিননা' ক্রিয়াপদটির অর্থ হল 'খনন করা', আর যারা কুয়ো খোঁড়ে তাদের বলা হয় 'কিনিয়া'। সিদ্ধ-দৃষ্টিসম্পন্ন 'সিরবি' পাতালের জল 'দেখতে' পায় এবং তার নির্দেশমতো সিদ্ধ-হস্ত কিনিয়া সেখানে খোঁড়ার কাজ আরম্ভ করে। কিনিয়া কোনো বিশেষ জাতি নয়। এ কাজে নিপুণ, যেকোন জাতির মানুষই কিনিয়া বলে পরিচিতি পেতে পারে। তবে মেঘওয়াল, ঔড় এবং ভিল উপজাতীয় পরিবারগুলি থেকে সহজেই কিনিয়া বেরিয়ে আসে।

কুয়োর ব্যাস নির্ধারিত হয়, মাটির তলায় কতটা জল পাওয়া যাবে তার ওপর ভিত্তি করে। যদি জল বেশি পাওয়া যাবে— এমন আন্দাজ করা যায়, তাহলে ব্যাস

বড় করা হয়। তখন জল তোলার জন্য একটা নয়, দুটো এমনকী চারটে চড়সও লাগতে পারে। তবে ব্যবস্থা এমন করা থাকে যে একসঙ্গে ওপরে ওঠার সময়ও চড়সগুলি একে অন্যের সঙ্গে ধাক্কা না লাগায়।

রাজস্থানে যেসব অঞ্চলে ভৌমজল খুব একটা গভীরে নয়, সেখানে পুরো খোঁড়া হয়ে গেলে আভ্যন্তরীণ জলের উৎসপথগুলি পেয়ে যাবার পর নীচের দিক থেকে ওপর পর্যন্ত বাঁধিয়ে দেওয়ার চল আছে। সাধারণ পাথর এবং ইঁট দিয়েই বাঁধানোর কাজ হয়। এ রকম বাঁধানোর কাজ 'সিধ' অর্থাৎ সোজা বলেই পরিচিত। তবে যেখানে ভৌমজল অনেক গভীরে, সেখানে মাটি খুঁড়ে ক্রমাগত নামতে থাকলে ওপর থেকে মাটি ধবসে যাবার প্রবল আশঙ্কা থাকে। সে ক্ষেত্রে কুয়োগুলিকে ওপর থেকে নীচে ধাপে ধাপে বাঁধানো হয়। কিছুটা খোঁড়া হল, সেটুকু বাঁধিয়ে নেওয়া হল, তারপর অবার চলল খোঁড়ার কাজ। এই উল্টো রকমের বাঁধানোর পদ্ধতিকে বলা হয় 'উন্ধ'। জল যদি আরও গভীরে হয়, সেখানে সাধারণই হোক বা উন্ধ, প্রচলিত পাথরের কোন ধরনের বাঁধা-ই নিরাপদ নয়। সেক্ষেত্রে খাঁজে খাঁজে আটকে যেতে পারে, এরকম অনেক পাথর তৈরি করা হয়। খাঁজ বা ঘাট যেমন ডাইনে-বাঁয়ে থাকে, তেমন ওপর নীচেও থাকে। প্রতিটি পাথরের খণ্ড তার ওপরে-নীচে এবং দুপাশের পাথরের সঙ্গে খাঁজে খাঁজে আটকে গোল হয়ে কুয়োর সীমানা বরাবর এক স্তর বাঁধাই শেষ করে। এভাবে পুরো কাজটা হয়ে গেলে আবার নতুন করে খোদাই শুরু হয়। একে বলে 'সুখী' বাঁধাই।

কোথাও কোথাও গভীরতার সঙ্গে মাটির চরিত্রও এমন ভাবে বদলে যেতে থাকে যে সিন্ধ, উন্ধ বা সুখী তিন ধরনের বাঁধাই-এর কোনোটাই কাজে আসে না। তখন একটু একটু করে খোঁড়া হয় আর গোলাকারে বাঁধানো হতে থাকে এবং কিছুটা গভীরে গেলেই শুরু হয় 'ফাঁক খোদাই'-এর প্রক্রিয়া। বৃত্তাকার মেঝেটির চারভাগের একভাগ খুঁড়ে আগে সেটুকু বাঁধিয়ে পোক্ত করে নেওয়া হল। এবার খোঁড়া হবে ঠিক তার বিপরীতের এক চতুর্থাংশ অংশটি। সেটিও বাঁধানো হবে একই ভাবে এবং জল না পাওয়া পর্যন্ত কাজ চলতে থাকবে। এভাবে চার হাত পরিমাণ খুঁড়তে হলে চার-চার হাতের হিসেবে ভাগ করেই খোঁড়া হতে থাকে। নীচে যদি কখনো 'চাটান' অর্থাৎ বিস্তৃত পাথরের স্তরে এসে খোঁড়ার কাজ আটকে যায়, তাহলেও বারুদ দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তা কখনো ফাটানো হয় না। কারণ বিস্ফোরণের শব্দের কম্পন ওপরের বাঁধাই কমজোরি করে দিতে পারে। তাই এক্ষেত্রে তা হাতেই আস্তে আস্তে ভাঙা হয়।

ভূপৃষ্ঠ ও পাতালকে জুড়তে হবে। কিন্তু অত্যন্ত সাবধানে। ভূপৃষ্ঠের মাটি যেন পাতালে ধ্বসে না পড়ে তাই বাঁধানোর এত রকমের ব্যবস্থা। 'গিলি' গাঁথনিতে সাধারণ সুরকি চুনে কাজ চলে না। তার সঙ্গে ইঁটের ছাই, বেলের আঠা, গুড়, পাটের খুবই মিহি টুকরো প্রভৃতি খুব ভালোভাবে মেশাতে হয়। কখনো আবার বলদে টানা চাকির মোটা চুন, হাত চাকিতে পিষে আরও মিহি ও মসৃণ করে নেওয়া হয়। এত গভীর ও ভারী কাজ যাতে বছরের পর বছর টিকে থাকে তার জন্যই এত ব্যবস্থা। কুয়োর ভেতরের কাজ শেষ হলে পর ওপরের কাজ শুরু হয়। তবে ওপরে শুধু কুয়োর পাড় বাঁধিয়েই কাজ শেষ হয় না। আরো অনেক কাজ থাকে। অবশ্য তার কারণও আছে। একে তো জল উঠবে সেই অতল গভীর থেকে। তাও যদি ছোট বালতিতে তোলা হয়, তাহলে তিনশো হাত টেনে তোলার পরিশ্রমের পর কীই বা পাওয়া গেল? তাই বড় ডোল বা চড়সে করে জল তোলা হয়। এতে একসঙ্গে আট-দশ বালতি জল একসঙ্গে ওপরে উঠে আসে। তাই এত বড় ডোল ওপরে তুলতে যে ভুন বা চক্র লাগবে, তাও হওয়া চাই যথেষ্ট মজবুত। যে থামের সাহায্যে ভুন লাগানো হবে, তাও হবে শক্তপোক্ত। এতটা জল একসঙ্গে ওপরে উঠে আসায় তা ঢেলে রাখার জন্য রয়েছে কুণ্ড। কুণ্ডের জল বয়ে এসে আরও একটা বড় কুণ্ডে জমা হয় যেখান থেকে সহজে জল নেওয়া যাবে। আর ঢালাঢালির সময় যে অল্প একটু জল কুয়োর পাড়ে পড়বে –তাও সংগ্রহ করে নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এ জলটুকু সংগ্রহ করা হয় পশুদের জন্য। সব কিছু করতে করতে ক্রমে এত কিছু তৈরি হয়ে যায় যে, ছোট বাড়ি, বিদ্যালয় বা মহলের মতোই লাগে।

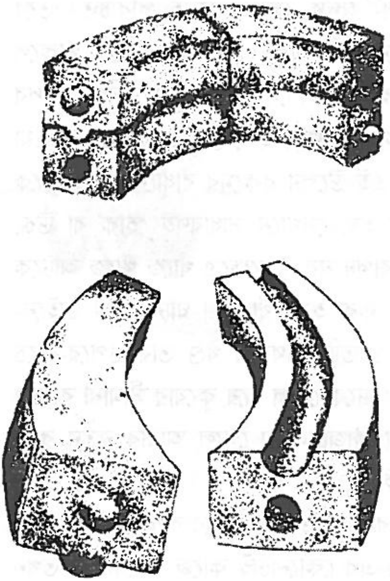

পাতালের গভীর থেকে জল তুলে আনতে অনেক উপকরণেই প্রয়োজন। বিশাল এই কর্মকাণ্ডের সব থেকে ছোট অংশগুলোও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা

ছোট অংশগুলো কাজ না করলে বড় অংশগুলোও কাজ করবে না। প্রতিটি জিনিসই কাজের, তাই প্রত্যেকটিই সুনামেরও।

প্রথমে দেখা যাক ভূ-জলের নাম— 'পাতাল পানি' তো আছেই, তাছাড়াও সেবো, সেজো, সোতা, ওয়াকল পানি, ওয়ালিও, ভুঁই জল প্রভৃতি বিভিন্ন নামে তাকে ডাকা হয়। আরো দুটো নাম হল; সির ও তলসির। ভৌমজল ছাড়াও 'সির' শব্দটির আরও দুটি অর্থ আছে। প্রথমত মিষ্টি, দ্বিতীয়ত প্রতিদিনের উপার্জন। একদিক থেকে দুই অর্থেরই কুয়োর জলের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। প্রতিদিনের উপার্জনের মতোই কুয়োও দেয় প্রতিদিনের পানীয় জল। তবে মিতব্যয়িতা ও পূর্ব পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা ছাড়া এই রোজগারে কোনমতেই পোষাবে না। পৃথিবী তথা সংসার-স্বরূপ কুয়োর জগতে বিভিন্ন ধরনের কুয়ো-ই রয়েছে। না-বাঁধানো কাঁচা কুয়োকে বলে 'দ্রহ', 'দহড়' অথবা 'দৈড়'। বর্গীয় ব (ব) এবং অন্তস্থ ব (ব ওয়)-এর পার্থক্যে 'বেরা' ও 'ওয়েরা' এবং 'বোরি' ও 'ওয়েরি' - এই চারটি নামও পাওয়া যায়। কুণ্ড, কূপ তো আছেই, আরও একটি নাম হল 'পাহুর'। শোনা যায় কোন এক সময় পাহুর রাজবংশ এত কুয়ো তৈরি করিয়েছিল যে ওই এলাকায় দীর্ঘদিন কুয়োর একটি প্রতিশব্দ হয়ে যায় পাহুর। 'কোইটো' অথবা 'কোসিটো' হল অগভীর কুয়ো। আর গভীর কুয়োকে বলা হয় 'কোহর'। বেশিরভাগ জায়গাতেই যেহেতু ভৌমজল অনেক গভীরে তাই গভীর কুয়োর প্রতিশব্দই পাওয়া যায় বেশি। যেমন : পাখাতল, ভমলিয়ো, ভঁওয়র কুয়ো, খারিকুয়ো ইত্যাদি । চওড়া কুয়োর নাম বৈরাগর। যে কুয়োতে চারটি দিকে একই সঙ্গে জল তোলা যায়, তাকে বলে 'চৌতিনা'। চৌতিনার আরেকটি প্রতিশব্দ হল 'চৌকরণো'। যে কুয়োতে জল পর্যন্ত নেমে যাওয়ার সিঁড়ি করা আছে, তা হল 'বাউড়ি',

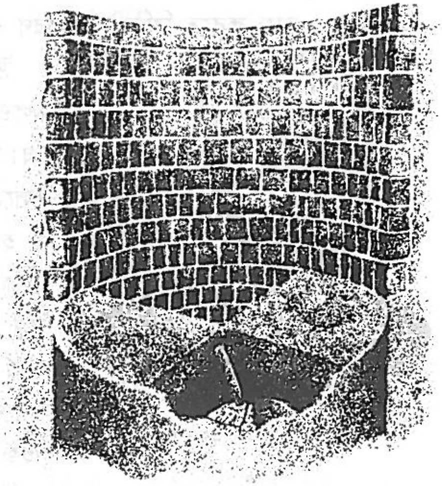

'পাগবাও' বা 'ঝালর'। আর শুধু পশুদের জল খাওয়ানোর জন্য যে কুয়ো তার নাম 'পিচকো' বা 'পেজকো' ।

গভীর কুয়ো থেকে জল তুলতে বড় আকারের ডোল অথবা চড়স ব্যবহার করা হয়। সাধারণত এক ঘড়ায় কুড়ি লিটার জল ধরে। ডোলে দু-তিন ঘড়া জল সহজেই পাওয়া যায়। চড়স, মোট, ও কোস হয় সাধারণত সাত ঘড়ার। এর আরও দুটি প্রতিশব্দ 'পুর' এবং 'গাঞ্জর'। সবগুলিতেই প্রচুর জল ধরে। তাই ভর্তি অবস্থায় এগুলিকে দু-তিনশো হাত ওপরে টেনে তোলা, জল ঢেলে নেওয়া এসব ভারী পরিশ্রমসাধ্য কাজ করতে বিভিন্ন উপকরণ ও সাবধানতা – দুটোই প্রয়োজন।

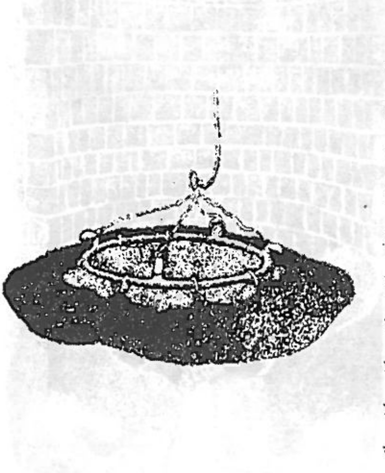

উট অথবা জোড়া বলদের সাহায্যে জলভর্তি চড়স কুয়ো থেকে টেনে তোলা হয়। চড়সের ভার অত গভীর থেকে টেনে তুলতে যাতে তাদের বেশি পরিশ্রম করতে না হয়, সেজন্য কুয়োর সঙ্গে তৈরি করা থাকে সারণ। এটি হল এক ধরনের ঢালু রাস্তা। উট বা বলদ চড়স টেনে তোলার সময় এই রাস্তা দিয়ে নীচের দিকে চলে। সারণের ঢাল, ভার টেনে তোলার কাজটা সহজ করে দেয়। 'সারণ' শব্দটির একটি অর্থ হল 'যে কাজ সারে'। সত্যি সত্যিই সারণ গভীর কুয়ো থেকে জল তোলার কাজে অপরিহার্য ভূমিকা নেয়। কুয়ো যতটা গভীর, সারণ যদি ততটাই লম্বা করা হয়, তাহলে প্রথম কথা, জায়গা অনেক লাগবে; দ্বিতীয়ত, ঢালের শেষ প্রান্তে নেমে যাওয়ার পর খুব আস্তে আস্তে চড়াইতে উঠে বলদ বা উটের দ্বিতীয়বার জল তোলা শুরু করতে অনেক সময় লেগে যাবে। এজন্য কুয়ো যতটা গভীর, সারণের দৈর্ঘ্য হবে তার অর্ধেক এবং এক জোড়া বলদের বদলে দু জোড়া বলদ ব্যবহার করা হয়।

তিনশো হাত গভীর কুয়োতে চড়স ভরা হলে প্রথম জোড়া বলদ দেড়শো হাত লম্বা সারণ বরাবর শেষ প্রান্তে নেমে গিয়ে সেটাকে অর্ধেকটা ওপরে তুলে আনে। তখন ক্ষণিকের মধ্যে বিশেষ কায়দায় চড়সের দড়ি দ্বিতীয় জোড়া বলদের কাঁধে জুতে দেওয়া হয়। আর প্রথম জোড়াকে দড়ি থেকে মুক্ত করে আবার হাঁটিয়ে চড়াইয়ের ওপরে উঠিয়ে আনা হতে থাকে। মাঝের সময়ে দ্বিতীয় জোড়া বলদ

বাকি দেড়শো হাত টেনে চড়সটিকে ওপরে তুলে আনে। পাতালের জল ভূপৃষ্ঠে বহমান হয় এভাবেই। সম্পূর্ণ একবার কাজটি করা হলে, তাকে বলে 'বারি' অথবা 'ওয়ারো' আর যারা কাজ করে তাদের নাম হল 'বারিয়ো'। অত্যন্ত ভারী জলপূর্ণ চড়স কুয়োর বাইরে এনে খালি করতে গেলে বুদ্ধি ও শক্তি দুয়েরই দরকার। ওপরে উঠে আসার পর চড়স যখন থামে তখন সেটি হাত দিয়ে টেনে আনা হয় না। কেননা এতে চড়সের সঙ্গে বারিয়ো-ও কুয়োর ভেতর চলে যেতে পারে। তাই চড়সটিকে প্রথমে উল্টোদিকে ধাক্কা দেওয়া হয়। ভারী হওয়ার জন্য চড়স দ্বিগুণ বেগে ফিরে আসে, পাড় পর্যন্ত এসে গেলেই চেপে ধরে এক ঝটকায় তা খালি করে ফেলা হয়।

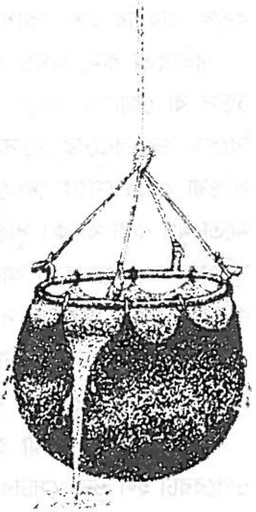

কোন এক সময় সমাজে বারিয়োদের এই কঠিন কাজের বিশেষ সম্মান ছিল। বিয়ের সময় বরযাত্রী এলে পংক্তি ভোজনে প্রথমে বারিয়োদের বসিয়ে ভালোভাবে খাওয়ানো হত। বারিয়োদের অপর নাম ছিল 'চড়সিয়ো', অর্থাৎ যারা চড়স খালি করে। এ কাজে বারিয়োদের সঙ্গী হল 'খাম্ভি' অথবা 'খাম্ভোরি'। খাম্ভিরা বলদগুলোকে সারণের নীচের দিকে নামিয়ে নিয়ে যেত এবং চড়স অর্ধেকটা উঠে এলে বিশেষ কৌশলে এক ধরনের 'কীল' অর্থাৎ খুঁটির সাহায্যে চড়সের দড়ি প্রথম জোড়া থেকে খুলে দ্বিতীয় জোড়া বলদে জুতে দিত। তাই তাদের আরেক নাম ছিল 'কিলিয়ো'।

চড়সের সঙ্গে বলদকে যে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়, সেটির নাম হল 'লাব'। লাব, ঘাস বা শন দিয়ে নয়, তৈরি হয় চামড়া দিয়ে। কারণ, ঘাস বা শনের দড়ি দু-মণ ওজনের চড়স সারাদিন ধরে তোলা-নামানোর পক্ষে যথেষ্ট শক্ত নয়। তাছাড়াও বার বার জলে ডোবার ফলে ঘাস বা শনের দড়ি তাড়াতাড়ি পচে যাবে। তাই চড়সের দড়ি সবসময় চামড়ার লম্বা লম্বা পট্টি জুড়ে বানানো হয় এবং ইঁদুরের নাগালের বাইরে নিরাপদ স্থানে ঝুলিয়ে রাখা হয়। সাবধানে ঠিকঠাক ব্যবহার করলে একটি লাব পনেরো-কুড়ি বছর জল তুলতে পারে।

'বরত', লাবের আর একটি প্রতিশব্দ। এটি তৈরি হয় মোষের চামড়া দিয়ে। মরুভূমিতে গরু, বলদ বা উট থাকলেও মোষ বেশি নেই; তাই একসময় পাঞ্জাব

অঞ্চল থেকে মোষের চামড়া এখানে নিয়ে আসা হত। যোধপুর, ফলৌদি, বিকানের প্রভৃতি শহরে চামড়ার জন্য বাজারও বসত। কোথাও কোথাও অবশ্য চড়সের বদলে ব্যবহার হত 'কোস'। এগুলি উট কিংবা বলদের চামড়ায় তৈরি।

গভীরতা কম, অথচ জল ভালই পাওয়া যায়— এরকম কুয়োতে জল তুলতে চড়স বা কোসের বদলে 'সুণ্ডিয়া' কাজে লাগে। এটি অবশ্য আলাদা কিছুই না, বিশেষ এক ধরনের চড়সই, যা ওপরে ওঠার পর নিজে নিজেই খালি হয়ে যায়। সুণ্ডিয়া ওপর থেকে দেখতে ঠিক চড়সের মতোই, তবে এর নীচে হাতির শুঁড়ের মতো মুখ করা থাকে। সুণ্ডিয়ার জন্য দুটো দড়ি দরকার। একটা চামড়ার দড়ি যেটা সুণ্ডিয়াকে ওপরে তুলে আনে, আর দ্বিতীয়টা শুঁড়ে বাঁধার জন্য একটু পাতলা দড়ি। কুয়োর ভেতরে যাওয়ার সময় শুঁড়ের ওই মুখ ভাঁজ হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। জল ভরে ওপরে ওঠার সময়ও সেটা বন্ধ থাকে। কিন্তু ওপরে উঠে এলেই মুখ খুলে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত জল খালি হয়ে যায়।

যে কুয়োতে সুণ্ডিয়া জল তোলে, সেই কুয়োতে দুটো চরকি লাগানো হয়। ওপরেরটা হল ভুন। সেটার চার হাত নীচে সুণ্ডিয়ার শুঁড় খোলার জন্য লাগানো হয় আরেকটা চরকি; যার নাম 'গিড়গিড়ি'। ভুন যেহেতু পুরো ওজনটাই টেনে তোলে, তাই তার চেহারা হয় চাকার মতো। আর গিড়গিড়ি যেহেতু হালকা কাজই করে, তাই সেটি হয় বেলনাকৃতি।

নাম আর কাজের তালিকা শেষ-ই হতে চায় না। সুণ্ডিয়ার বড় যে মুখটা লোহার তার বা বাবলা কাঠ দিয়ে বাঁধা হয়, তার নাম 'পাঁজর'। পাঁজরের সঙ্গে সুণ্ডিয়ার চামড়া বাঁধা হয় 'কসন' দিয়ে। মুখটা খোলা রাখার জন্য যে চৌকো কাঠ লাগানো হয়, তাকে বলে 'কলতরু'। কলতরুকে মুখ্য দড়ি অর্থাৎ বরতের সঙ্গে বাঁধে আরো একটি দড়ি। এই দড়ির নাম 'তোড়ক'। লাবের এক দিকে বাঁধা থাকে এইগুলি, অন্যদিকে থাকে জোড়া বলদ। চড়স টানার জন্য বলদ জোড়ার কাঁধে জোয়ালের মতো যা বাঁধা থাকে তা হল 'পিঁজরো'। পিঁজরো দিয়ে বলদ দুটির কাঁধ আটকানো হয়। পিঁজরোতে চার ধরনের কাঠ লাগানো থাকে। চারটির প্রত্যেকটিরই আলাদা আলাদা নাম রয়েছে। ওপরে লম্বালম্বি যে কাঠটি থাকে, সেটি হল 'কোকরা'। নীচের হালকা কাঠটিকে বলা হয় ফট'। চওড়ার দিকে লাগানো প্রথম দুটো পট্টির নাম 'গাটা' এবং ভেতরের দুটোর নাম 'ধুসর'।

আজকাল কোনো কোনো জায়গায় কুয়োতে বৈদ্যুতিক এবং ডিজেল পাম্প লাগানোর ফলে এই সমস্ত নাম ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। নতুন যুগের

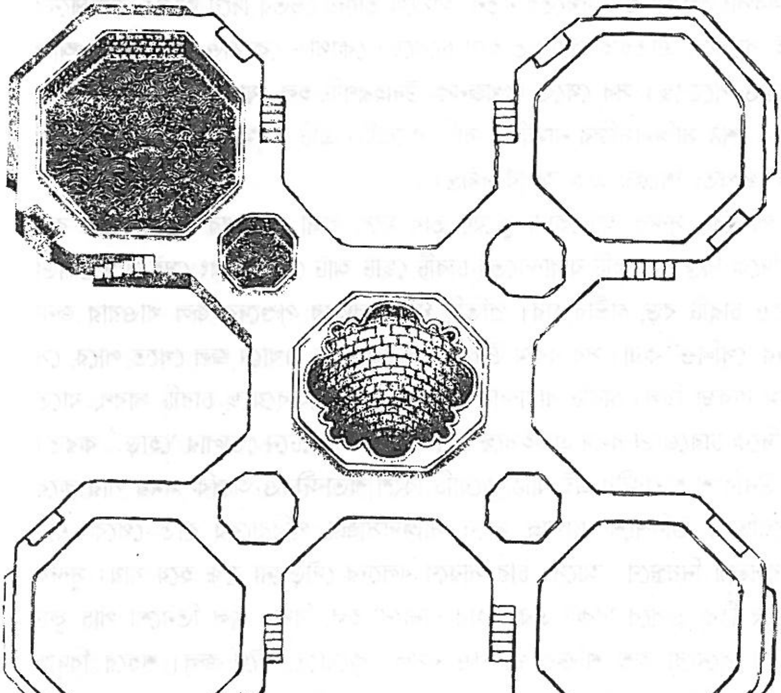

যন্ত্রগুলিতে চড়স অথবা কোসের মিতব্যয়িতা নেই। অনেক পুরনো সাঠি অথবা চৌতিনো কুয়োতেই আজকাল বলদের বদলে ঘোড়া'র সাহায্যে, অর্থাৎ হর্স পাওয়ারের পাম্পের সাহায্যে জল তোলা হচ্ছে। গত কয়েক বছরে পুরোনো ও নতুন কয়েকটি এলাকায় জলসরবরাহের কিছু পাইপ বসানো হয়েছে। তবে পাইপগুলোরও জলের উৎস সেই ষাঠি অথবা চৌতিনো কুয়োতে বসানো অশ্বশক্তির পাম্প। অর্থাৎ জলেরপাইপগুলো শুধু দেখতেই নতুন, আসলে তাদের ভেতর দিয়ে আজও রাজস্থানের সেই পুরোনো ঐতিহ্যই প্রবাহিত হয়ে চলেছে। কোথাও কোথাও এই ঐতিহ্য আজ ভেঙেও পড়েছে। সব থেকে দুঃখজনক উদাহরণটি হল যোধপুর জেলার ফলৌদি শহরে শেঠ সাঙ্গিদাসজির নামাঙ্কিত ষাঠি কুয়োটি। এটি শুধুমাত্র একটি কুয়োই নয়, বরং স্থাপত্য শিল্পের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

পাথরের সুন্দর আটকোণা কুয়ো, তার মধ্যে লম্বা বারান্দার মতো চারটি বাহু চারদিকে বিস্তৃত। চারটি বারান্দাতেই চারটি ছোট আট কোণা এবং সেই সঙ্গে জোড়া আরও চারটি বড়, গভীর ঘর। প্রতিটি ঘরের বাইরে পশুদের জল খাওয়ার জন্য সুন্দর 'খেলিও'[১]করা। সব রকম উচ্চতার পশুই যাতে এখানে জল খেতে পারে, সে রকম ব্যবস্থা ছিল। চারটি বারান্দার চারদিক থেকে বেরিয়েছে চারটি সারণ, যাতে চারদিকে চারজোড়া বলদ একইসঙ্গে কোস নিয়ে জল টেনে তোলার 'হোড়'[২] করত।

উনবিংশ শতাব্দীর এই ষাঠি কুয়োটি বিংশ শতাব্দীরও অর্ধেক সময় পার করে ফেলেছিল। ঊনিশশো ছাপান্ন সালে সাঙ্গিদাসজির পরিবারের হাত থেকে এটি পৌরসভার নিয়ন্ত্রণে আসে। চার সারণে বলদের দৌড়ানো স্তব্ধ হয়ে যায়। সুন্দর কুয়োর ঠিক ওপরে বিকট একটা ঘর বানানো হল, বিদ্যুৎ এল তিনশো পাঁচ ফুট গভীরে পনেরো অশ্ব শক্তির পাম্পও বসল। কুয়োতে অথৈ জল। শহরে বিদ্যুৎ থাকলে চব্বিশ ঘন্টাই পাম্প চলত, দিন-রাত প্রতি ঘণ্টায় হাজার গ্যালন জল উঠে আসত। এরপর পাম্পে মোটরের শক্তি পনেরো থেকে বাড়িয়ে পঁচিশ হর্স পাওয়ার করা হল। কুয়ো পরিষ্কার করা বন্ধ হল। শুধু জল তোলা হতে লাগল। ক্রমে দেখা গেল জল কিছুটা কমে গেছে। এটা ছিল কুয়োর সংকেত— জল তো পুরো নিচ্ছ, কিন্তু দেখাশোনাও যে করা দরকার, তা কিন্তু ভুলে গেছ। পৌরসভা সংকেতের অর্থ করল অন্যরকম। আরও সত্তর ফিট বোরিং করা হল। তিনশো হাত কুয়োতে যোগ হল আরও সত্তর ফিট। উনিশশো নব্বই সাল আসতে আসতে কুয়ো ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তবুও সে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত দেহে আরও চার বছর শহরের

সেবা চালিয়ে গেল। শেষে উনিশশো চুরানব্বই-এর মার্চ মাসে সাঙ্গিদাসজির কুয়ো জবাব দিল।

আজও এতে জল আছে, কিন্তু পরিষ্কার না করানোর ফলে ভূগর্ভে জলস্রোতের উৎসগুলির সাথে সংযোগ বুজে গেছে। পরিষ্কার করতে ওই পাতালে কে নামবে? যে শহরে এমন সুগভীর কুয়ো খোঁড়ার কিনিয়া পাওয়া যেত, তা পাথর দিয়ে বাধার গজধর পাওয়া যেত, আজ সেখানে পৌরসভা তা পরিষ্কার করানোর লোক খুঁজে পাচ্ছে না।

অথচ বিকানের শহরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে তৈরি সুবিশাল চৌতিনা কুয়ো আজও যে শুধু মিষ্টি জল দিয়ে চলেছে, তাই-ই নয়, এই কুয়োর স্থাপত্যের মধ্যেই পৌরসভার সদর-দপ্তর রয়েছে, সেখানে আশেপাশের পাড়ার বিদ্যুতের বিল, জলকর আদায় হচ্ছে; এমনকী জল সরবরাহ দপ্তরের কর্মচারী ইউনিয়নেরও কাজ চলছে। আগে চার সারণে আট জোড়া বলদ জল তুলত। এখন বড় বড় বৈদ্যুতিক পাম্প বসেছে, দিনরাত জল তোলা হচ্ছে, তবুও চৌতিনো কুয়ো অথৈ। সবসময়ই কুড়ি-পঁচিশটা সাইকেল, স্কুটার ও মোটরগাড়ি কুয়োর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। সমস্ত কিছুকে নিজের হৃদয়ে স্থান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কুয়োটি কাছে এবং দূরে যেকোন জায়গা থেকেই সামান্য কুয়ো মাত্র মনে হয় না, বরং কোনো ছোট সুন্দর রেল স্টেশন, বাস স্ট্যান্ড অথবা মহলের মতো মনে হয়।

এখানে এ,রকম একটা নয়, অনেক কুয়ো আছে। আর, শুধু এখানেই নয়, অনেক জায়গাতেই পাওয়া যায় এরকম কুয়ো, কুঁই, কুণ্ড এবং টাঁকা। পুকুর আছে, বাওড়ি আছে, পাগবাও, নাডি, খডিন, দইবাঁধ স্থান, ভে সবই আছে, যেগুলিতে বৃষ্টির রজত বিন্দুগুলিকে সংগ্রহ করে রাখার ব্যবস্থা অমলিন। মাটি, জল ও তাপের তপস্বী এই দেশ প্রবাহিত এবং স্থির দুরকম জলকেই নির্মল করে রেখেছে। পালর পানি, রেজানি পানি এবং পাতাল পানির প্রতিটি বিন্দুই এদের কাছে সিন্ধু সমান, ইন্দ্রের এক মুহূর্তকে এরা নিজেদের জন্য বারো মাসে রূপান্তরিত করে নিয়েছে।

সুদূর অতীতের আদিগন্ত ঢেউ তোলা অখণ্ড সমুদ্র আজো এখানে খণ্ড খণ্ড হয়ে মাটিতে নেমে আসে।

স্বাবলম্বী সমাজ

রাজস্থানে, বিশেষ করে মরুভূমির সমাজ জলসংগ্রহের বিষয়টিকে নিছক কোন কাজ হিসেবে না নিয়ে পবিত্র কর্তব্য হিসেবে নিয়েছিল। সেইজন্য আজকাল যাকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বলা হয়ে থাকে সেসবের ঊর্ধ্বে উঠে এটি একটি সমগ্র জল সচেতনতার দর্শনে উত্তরণ লাভ করেছে।

উনিশশো সাতাশি সালে, আমাদের এই দর্শন বুঝে ওঠার পালা খুব সাধারণ ভাবেই শুরু হয়েছিলো। বিকানের অঞ্চলের গ্রাম ভিনাসর, সেখানে গোচারণ ভূমি বাঁচানোর আন্দোলন চলছিল। সেই সংকটে গ্রামের লোকেদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আমরা সেখানে পৌছাই।

ভিনাসর গ্রামের গোচারণ ভূমির সঙ্গে লাগোয়া একটা ছোট সুন্দর মন্দির ও বাগান আছে। বাগানের এক কোণায় সুন্দর নিকানো লেপা উঠোন। এর চারদিকেই মোটামুটি এক হাত উঁচু দেওয়াল। কোণার দিকে ট্যাংকের মতো কিছু একটা তৈরি করা হয়েছে। সেটা আবার কাঠের ঢাকনা দিয়ে ঢাকা। তার সঙ্গে দড়ি-বাঁধা একটা বালতিও ছিল। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল একে টাঁকা বলে। এতে বর্ষার জল সংগ্রহ করে রাখা হয়। উঠোনের বাইরে জুতো খুলিয়ে আমাদের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল। ঢাকনা খুলে দেখার পর বোঝা গেল, ভেতরে সুবিশাল একটা কুণ্ডে জল ভর্তি।

রাজস্থানে জল-সংগ্রহের বিশাল ঐতিহ্যের সঙ্গে এই ছিল আমাদের প্রথম পরিচয়। এরপর যেখানেই গেছি, সেখানেই এই ঐতিহ্যকে আরেকটু ভালোভাবে বুঝতে পারার সৌভাগ্য হয়েছে। তার আগে তো রাজস্থান সম্পর্কে এ কথাটাই শুনেছিলাম যে সেখানে জলের ঘোরতর সংকট। সেখানকার সমাজ খুবই কষ্টের সঙ্গে জীবন যাপন করে। কিন্তু জল সংগ্রহের নমুনাগুলি থেকে অন্য এক চিত্রই বেরিয়ে আসছিল। তখন এই বিচিত্র জল -সংগ্রহ প্রক্রিয়ার অনেক ছবিও তুলেছিলাম।

তখন পর্যন্ত যে টুকরো টুকরো তথ্য জমা হয়েছিল, সেগুলো নিয়ে সসংকোচে এক-আধবার রাজ্যের কিছু সামাজিক সংস্থার সঙ্গে কথা বলি। তখনই বুঝতে পারলাম, এখানে যে সমস্ত সংস্থা মানুষের মধ্যে কাজ করছে, তারা নিজেদের

সমাজের এ নিপুণতা থেকে বিচ্ছিন্ন। এ ব্যাপারে আমরা যারা রাজস্থানের বাইরের লোক, তাদের সঙ্গে ওদের বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। সংকোচ কিছুটা কাটল। তার পর থেকে যখন যেখানে সুযোগ হয়েছে, এই অর্ধেক-জানা তথ্যগুলোই সেসব স্থানে পৌঁছাতে শুরু করে দিই।

এ কাজের গভীরতা এবং বিস্তার দুটোই বুঝে ওঠা ছিল আমাদের সাধ্যাতীত। সারা রাজস্থান জুড়ে জায়গায় জায়গায় ছড়িয়ে থাকা কাজগুলির কথা নতুন শিক্ষাক্রমে, বইতে, গ্রন্থাগারে— সর্বত্রই অনুপস্থিত। বিভিন্ন সরকারের আসা যাওয়ার মাঝখানে, নতুন সরকারী-সামাজিক সংস্থাগুলিও সমাজের এই বিস্তৃত কাজকে বিস্মৃতির অন্ধকারেই ঠেলে দিয়েছে। শুধু মাত্র মানুষের স্মৃতিতেই বেঁচে ছিল কাজের নমুনা। তাঁরাই এই স্মৃতিকে শ্রুতি শাস্ত্রের মতোই যেন মুখে মুখে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে সমর্পণ করে আসছিল। এই স্মৃতি, শ্রুতি ও কৃতি আমরা খুব ধীরে ধীরে, বিন্দু বিন্দু করেই বুঝতে পেরেছি। পুরো চেহারাটার কিছু অঙ্গপ্রতঙ্গ দেখতে পাচ্ছিলাম, সাধারণ কিছু কিছু কথা বুঝতেও পারছিলাম, কিন্তু কাজের আত্মিক চেহারাটা অনুভব করি আরো আট-নয় বছর পরে। জয়সলমেরে গিয়ে সেখানে শ্রীভগবানদাস মহেশ্বরী, শ্রীদীনদয়াল ওঝা এবং শ্রীজেঠুসিং ভাটির মতো সজ্জন মানুষদের সঙ্গ পেয়েই তা সম্ভব হয়।

জলসংগ্রহের ব্যাপারে রাজস্থানের জনসমাজ বহু বছরের সাধনায় এবং নিজেদের সামগ্রীতেই যে গভীরতা ও উচ্চতাকে স্পর্শ করেছে, তার সঠিক তথ্য— প্রচুর বর্ষা হওয়ার পরেও তৃষ্ণার্ত থেকে যায় দেশের যে সমস্ত অঞ্চল সেসব জায়গায় অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। সাথে সাথে এও মনে হয়েছে যে, পৃথিবীর অন্যান্য মরুভূমিতেও এই কাজের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। সেই সূত্রেই এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন মরুভূমি সম্পর্কে কিছু-কিছু তথ্য জোগাড় করি। কিছু প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সম্পর্কও গড়ে ওঠে।

আজ প্রায় পৃথিবীর একশোটি দেশে মরুভূমি ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে আমেরিকা, রাশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার মতো বড়লোক দেশের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক। এমনকী চাইলে পেট্রলের জন্য সম্প্রতি বড়লোক হওয়া উপসাগরীয় দেশগুলিকেও আমরা বাদ দিতে পারি। তবু এর পরও এশিয়া, আফ্রিকা আর দক্ষিণ আমেরিকায় এমন অনেক দেশ পাওয়া যাবে, যেখানে মরুভূমিতে জলের, বিশেষ করে পানীয় জলের ভয়ংকর অভাব। চট করে একথা বিশ্বাস হয় না যে সেখানকার জনসমাজ দীর্ঘ সময় ধরে সেখানে বসবাস করার পরও জল সংকটের সমাধানে তেমন কোনো বড় ধরনের কাজ করে উঠতে পারেনি;; যেরকম রাজস্থানের মানুষেরা অনায়াসে করতে

পেরেছে। সেখনকার জ্ঞানী-গুণী মানুষেরা আর বিভিন্ন সংস্থাগুলো তো একথাই বলে যে, সেসব স্থানে জলের ব্যাপারে কোন ঐতিহ্যবাহী ব্যবস্থাপনা নেই। যদিও বা ছিল, পরাধীনতার দীর্ঘ সময় কালে সেসব ছিন্নভিন্ন ও বিনষ্ট হয়ে গেছে।

এসব দেশে মরুভূমির প্রসার আটকাতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিবেশ বিষয়ক কার্যক্রমে এক বিরাট আন্তর্জাতিক পরিকল্পনার রূপায়ণ চলছে। তাছাড়াও আমেরিকা, কানাডা, নরওয়ে, হল্যান্ড, সুইডেন প্রভৃতি দেশের প্রায় আধ ডজন সংস্থা অনুদান হিসেবে প্রচুর টাকা এসব দেশে পানীয় জল জোগানোর উপায় বের করার জন্যই খরচ করছে। প্রচুর টাকার মালিক এসব সংস্থাগুলি এ কাজে নিজেদের দেশ থেকে পরিকল্পনা, পুঁজি, যন্ত্রপাতি, নির্মাণসামগ্রী থেকে শুরু করে বিশেষজ্ঞ, প্রযুক্তিবিদ্ পর্যন্ত সেখানে পাঠাচ্ছে। এমনকী বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সামাজিক কর্মী ও কর্মকর্তাও সেখানে যাচ্ছেন। জল সংগ্রহের এ হেন আন্তর্জাতিক প্রয়াসের এক বিচিত্র দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে বটসোয়ানা দেশ।

মরু রাজ্যের এই ছবির সঙ্গে তুলনা করুন রাজস্থানের।
এখানে সমাজ কয়েকশো বছর ধরে বৃষ্টির জলের
রজত বিন্দুগুলিকে
জায়গায় জায়গায় সংগ্রহ করে রাখার এক অনন্য ঐতিহ্য
তিলে তিলে তৈরি করেছে। আর এই ঐতিহ্যেই কম করে
কয়েক লক্ষ কুণ্ডি, কয়েক লক্ষ টাঁকা, কয়েক হাজার কুঁই এবং
কয়েক হাজার ছোট-বড় পুকুর তৈরি হয়েছে।
এর জন্য তারা কারো কাছেই হাত পাতেনি।

আফ্রিকার মরু অঞ্চলের একটি গণরাজ্য হল বটসোয়ানা। ক্ষেত্রফল পাঁচ লক্ষ একষট্টী হাজার আটশো বর্গকিলোমিটার; জনসংখ্যা আট লক্ষ সত্তর হাজার। তুলনা করুন রাজস্থানের সঙ্গে। ক্ষেত্রফলটা আরেকবার আউড়ে নেওয়া যাক : তিন লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার। বটসোয়ানার থেকে অনেকটাই কম। জনসংখ্যা কিন্তু চার কোটি। অর্থাৎ বটসোয়ানার জনসংখ্যার থেকে প্রায় পঞ্চাশ গুণ। বটসোয়ানার আশি শতাংশ অঞ্চল কালাহারি মরুভূমিতে পড়ে।

রাজস্থানের মরুভূমির তুলনায় বটসোয়ানার বর্ষার অবস্থা কিছুটা ভালোই বলা

চলে। এখানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত পঁয়তাল্লিশ সেন্টিমিটার। কালাহারি মরুভূমিতে পরিমাণ কিছুটা কমলেও পরেও তা ত্রিশ সেন্টিমিটারের কম নয়। আরও একবার স্মরণ করে নেওয়া যাক যে, থর মরুভূমিতে এই পরিমাণটা মাত্র ষোলো থেকে পঁচিশ সেন্টিমিটার। তাপমাত্রার দিক থেকেও কালাহারি থরের তুলনায় ভালো অবস্থাতেই আছে। সর্বোচ্চ তাপমান ত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশি হয় না। থর মরুভূমি কিন্তু অনেকসময়ই পঞ্চাশ ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেলে।

অর্থাৎ বটসোয়ানায় জায়গা বেশি, লোক কম, বর্ষাও কিছুটা ভালো এবং তাপমাত্রাও কম। ফলে বটসোয়ানার সমাজ কিছুটা ভাল অবস্থায় আছে একথা বলাই যেতে পারে। অথচ আজ এখানে জলের সংকট ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে। আগে হয়তো এখানে জল সংগ্রহের কোনো উন্নত ঐতিহ্য ছিল, কিন্তু আজকে তার চিহ্নমাত্র পাওয়া যায় না। দুটো সমাজের এভাবে তুলনা করা খুব একটা ভাল কাজ নয়, তবুও যেটুকু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, বটসোয়ানায় বেশি বৃষ্টি হলেও সেখানে সেই জল সংগ্রহ করে রাখার কোনো সমাজসিদ্ধ, স্বয়ংসম্পূর্ণ ঐতিহ্য দেখতে পাওয়া যায় না।

রাজস্থানের মতোই বটসোয়ানাতেও শতকরা পঁচাশি ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। তবে একটা তফাৎ আছে এবং তফাৎটা জলের অভাবের জন্যই। বটসোয়ানার মানুষ সারা বছর একই বাড়িতে না থেকে ঘুরে ঘুরে তিনটি বাড়িতে বাস করে। একটি ঘর হল গ্রামে, দ্বিতীয়টি চারণভূমিতে, তৃতীয়টি হল গোশালায়। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর সবাই গ্রামে থাকে, তারপর অক্টোবর থেকে জানুয়ারি পশুচারণ ক্ষেত্রে এবং ফেব্রুয়ারি থেকে জুন গোশালায়।

এখানে রাজস্থানের মতো কুণ্ডি, কুঁই, টাঁকা প্রভৃতির উপস্থিতি অন্তত আজকের দিনে দেখা যায় না। বেশির ভাগ জল পাওয়া যায় কুয়ো থেকে এবং বর্ষাকালে প্রাকৃতিকভাবে ভরে ওঠা পুকুরে।

যতটা তথ্য পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় যে, কানাডার একটি সংস্থার অনুদানের টাকায় উনিশশো পঁচাত্তর থেকে একাশির মধ্যে প্রথমবার বটসোয়ানায় জলসংগ্রহের জন্য কুণ্ডির মতো পদ্ধতির প্রয়োগ শুরু হয়। এই প্রকল্পে সরকারের বড় বড় আধিকারিক, বিদেশি ইঞ্জিনিয়ার ও জল বিশেষজ্ঞরা সেখানকার কিছু গ্রামে ঘোরেন। তারা খামারের আনাজ শুকানোর উঠোনগুলিকে কিছুটা ঢালু করে তার এক কোণায় গর্ত খুঁড়ে তাতে বর্ষার জল সংগ্রহ করেন। একশো ভাগ বিদেশি সহায়তা, অনেক দূর থেকে বয়ে নিয়ে-আসা নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে এখানে দশটি কুণ্ডি

তৈরি হল। প্রত্যেকটির সর্বপ্রকার লাভ-লোকসানের হিসেব সূক্ষ্মভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা শুরু হল। কুণ্ডিগুলি গোল না করে চৌকোভাবে বানানো হয়। চৌকো গর্তে মাটির চাপ চারপাশ থেকেই পড়ে তাই ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা বেশি। গোল না করে চৌকো করলে এতে পলেস্তরার ক্ষেত্রফলও বেশি হয় কিন্তু জল সংগ্রহের ক্ষমতা বাড়ে না। তাই সেইসব বিশেষজ্ঞরা এখন স্বীকার করছেন যে, ভবিষ্যতে কুণ্ডি চৌকো না করে গোল করাই ভাল।

যে গ্রামবাসীরা এই কুণ্ডিগুলি ব্যবহার করবে, এখন তাদের 'সরকারী ভাষায়' এর রক্ষণাবেক্ষণের কৌশলগুলো শেখানো হচ্ছে। কুণ্ডিতে যাতে জলের সাথে সাথে বালি না যায়, তারও ব্যবস্থা চলছে। বিশেষ এক ধরনের ছাঁকনি লাগানো হয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, এতে কিছু অসুবিধাও আছে। প্রতি বছর এই ছাঁকনি পাল্টাতে হবে। কুণ্ডিগুলোর মুখে বসানো সিমেন্টের ঢাকনাতেও ফাটল দেখা দিচ্ছে। তাই এই ঢাকনাগুলো পাল্টানোর কথাও চলছে; পাল্টানোর পর যে ঢাকনা লাগনো হবে সেগুলি গম্বুজাকৃতি করার কথা ভাবা হচ্ছে।

একই ভাবে ইথিওপিয়াতে আন্তর্জাতিক পাঁচটি সংস্থা জলসমস্যায় জেরবার গ্রামগুলিতে ছোট ছোট কুয়ো খোঁড়ার কাজ শুরু করেছে। ইথিওপিয়াতে ভৌমজল পেতে খুব একটা গভীরে যেতে হয় না। তাই কুয়োগুলিও কুড়ি মিটারের বেশি গভীর নয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের কাছে সব থেকে বড় সমস্যা হল, কুয়োগুলির পলেস্তরা। মাটি ধ্বসে পড়ছে। তুলনা করুন রাজস্থানের সেই ষাঠি কুয়াগুলির সঙ্গে - যেখানে তারা ষাট মিটারেরও বেশি গভীরে অনায়াসে চলে যায়। এদের পলেস্তরার সোজা, উল্টো ও ফাঁক পদ্ধতি না জানি কবে থেকে কার্যকর হয়ে আসছে।

ইথিওপিয়ায় এই ধরনের কুয়ো ছাড়াও অনেকগুলো হ্যান্ডপাম্প বসেছে। সোজা ইংল্যান্ড, আমেরিকা থেকে ভালো হ্যান্ডপাম্প আসছে। একটা ভালো হ্যান্ডপাম্পের দাম পড়ে প্রায় ছত্রিশ হাজার থেকে চল্লিশ হাজার টাকা। বলা হয় এই পাম্পগুলো খুবই টেঁকসই, বার-বার খারাপ হয় না, ভাঙেও কম। প্রতিটি গ্রামে এত দামী পাম্প বসাতে সরকারের ধার নেওয়া টাকাও কম পড়ছে। তাই শস্তা হ্যান্ডপাম্পের খোঁজও চলছে। সেগুলোও অবশ্য কুড়ি হাজার টাকার কম নয়। এগুলো আবার তাড়াতাড়ি খারাপ হয়। এদিকে একটা থেকে আরেকটা গ্রামের দূরত্ব অনেক। যোগাযোগ-ব্যবস্থাও উন্নত নয়। তাই পাম্পগুলোর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ শেখানোর জন্য সরকার গ্রামে গ্রামে প্রশিক্ষণ শিবির চালাতে তাদেরই কাছে অনুদান চাইছে— যেসব দেশ থেকে ঐ পাম্পগুলি কেনা হয়েছে।

তানজানিয়া দেশের মরুভূমি অঞ্চলেও বিদেশি সংস্থাগুলি একই ভাবে 'শস্তা ও বিশুদ্ধ' জল পাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে— গ্রামের সংকটজনক পরিস্থিতি সার্ভে করা হয়েছে, সার্ভের তথ্য গ্রাম থেকে জেলা, জেলা থেকে কেন্দ্র এবং কেন্দ্র থেকে আবার ইউরোপ পর্যন্ত পৌছাচ্ছে, বিমান থেকে এরিয়াল ফটো তোলা হয়েছে, বিদেশী স্পর্শকাতর সব যন্ত্রে ভৌমজলের পরিস্থিতি বিচার করে মানচিত্র তৈরি হয়েছে। এত কিছুর পর এখানে প্রায় দু-হাজার কুয়ো কাটা হল, কুয়োগুলির বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে সরাসরি কুয়ো থেকে জল তোলা নিসিদ্ধ হল, কুয়োতে হ্যান্ডপাম্প বসল। এবার দেখা যাচ্ছে হ্যান্ডপাম্পগুলি বিভিন্ন কারণে খারাপ হচ্ছে। তাই এখন এখানে হ্যান্ডপাম্পের 'আরো উন্নত ব্যবহার' প্রশিক্ষণের জন্য গ্রামীণ সংঘ তৈরি করা চলছে। হ্যান্ডপাম্প খারাপ হয়ে গেলে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যাতে গ্রাম ও জেলার মধ্যে দ্রুত খবর আদানপ্রদান করা যায়, সে জন্য তৈরি হচ্ছে নতুন পরিকাঠামো।

কেনিয়ার বালুকাময় এলাকায় শুরু হয়েছে ছাতে.বর্ষিত বৃষ্টির জল সংগ্রহের কাজ। জল সম্পর্কিত যেসব আন্তর্জাতিক সেমিনার হয় তাতে জনগনের অংশগ্রহণ কেনিয়া সরকারের আমলারা উৎকৃষ্ট উদাহরণ রূপে তুলে ধরেন।

পৃথিবীর অন্যান্য যত মরু রাজ্য, যেমন— বটসোয়ানা, ইথিওপিয়া, মালাউই, কেনিয়া, সোয়াজিল্যান্ড কিংবা সহেলের মতো দেশগুলি কি এভাবেই নিজেদের জন্য জলের ব্যবস্থা করবে? যদি এভাবে জল আহরণের সমস্ত উদ্যোগ ও প্রযুক্তিটাই বাইরের দেশ থেকে আসতে থাকে তাহলে কি তা দেশের একেবারে ভেতরের গ্রামগুলোর চাহিদা দীর্ঘ সময় ধরে মেটাতে পারবে? সমাজের নিজস্ব প্রতিভা এবং কৌশল, নিজেদের দেহ, মন এবং সম্পত্তি সব কিছুই যদি অনুপস্থিত থাকে, সবই যদি বাইরের থেকে আসে তাহলে জলই বা কতদিন উপস্থিত থাকবে সেখানে?

এসব দেশের সঙ্গে তুলনা করুন রাজস্থানের। রাজস্থানের সমাজ উনিশশো পঁচাত্তর থেকে একাশি বা পঁচানব্বই সালের মধ্যে নয়, কয়েকশো বছর ধরে বৃষ্টির জলের রজত বিন্দুগুলিকে সংগ্রহ করে রাখার এক অনন্য ঐতিহ্য তিলে তিলে তৈরি করেছে। আর এই ঐতিহ্যেই কম করে কয়েক লক্ষ টাঁকা, কয়েক হাজার কুঁই এবং কয়েক হাজার ছোট-বড় পুকুর তৈরি হয়েছে, যার সমস্তটাই নিজেদের দেহ, মন এবং পুঁজি দিয়ে নির্মিত। এর জন্য কারো কাছেই তাঁরা হাত পাতেননি।

এই রকম বিবেকবান, স্বাবলম্বী সমাজকে শত শত প্রণাম।

তথ্য সূত্র

পধারো মাহ্‌রে দেশ

কোনো এক সময় মরুভূমিতে ঢেউ তোলা হাকড়োর শুকিয়ে যাওয়ার ঘটনা, রাজস্থানের হৃদয় 'পলক দরিয়াব'-এর মতোই গ্রহণ করে। ঢেউ তোলা হাকড়োর সময় বা কালের বোধের ব্যাপকতাকে আমাদের স্মৃতির সাহায্যেই বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এই কাল দর্শনে আমাদের তিনশো পঁয়ষট্টি দিনকে এক দিব্য দিন ধরা হয়েছে। তিনশো দিব্য দিনে হয় এক দিব্য বর্ষ। সত্য যুগের সময় সীমা বলা হয়েছে চার হাজার আটশো দিব্য বছর, তিন হাজার ছশো দিব্য বছরে হল ত্রেতা যুগ, আর দ্বাপর দু হাজার চারশো বছরের এবং কলিযুগের সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে এক হাজার দুশো দিব্য বছর। এই হিসেবকে যদি আমাদের বছরে বদলানো যায় তাহলে সত্য যুগের সময়সীমা দাঁড়াবে সতেরো লক্ষ আঠাশ হাজার বছর, ত্রেতা যুগ হবে বারো লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার বছর, আর দ্বাপর আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার বছর এবং কলিযুগ দাঁড়াবে চার লক্ষ বত্রিশ হাজারে। শ্রীকৃষ্ণকে আমরা পাই দ্বাপরে। যখন তিনি হাকড়ো ক্ষেত্রে এসেছিলেন তখনও মরুভূমি ছিল। অর্থাৎ পলক দরিয়াবের ঘটনা তার থেকেও আগে কখনও ঘটেছিল।

একটা গল্প এই ঘটনাকে ত্রেতা যুগ পর্যন্ত নিয়ে যায়— শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীলঙ্কা আক্রমণ। মাঝে সমুদ্র রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়িয়েছিল। রামচন্দ্র তিন দিন উপবাসের পর পুজো করেন। এই প্রার্থনার পরও রাস্তা না পেয়ে রামচন্দ্র ধনুকে বাণ চড়ান, সমুদ্রের জল শুকিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। সমুদ্র দেবতা প্রকট হন, ক্ষমা প্রার্থনা করেন; কিন্তু বাণ তো ধনুকে চড়ানো হয়ে গিয়েছিল, তার কী হবে? কথিত আছে সমুদ্রের পরামর্শেই বাণ সেই দিকে ছোঁড়া হয় যেদিকে হাকড়ো ছিল। এভাবেই ত্রেতা যুগে হাকড়ো শুকিয়ে যায়।

সমুদ্রের ধারের জমিকে ফার্সিতে বলে 'শীখ'। বর্তমান মরুভূমির এক অংশ হল শেখাওটি। বলা হয়, কখনও এই পর্যন্ত সমুদ্র ছিল। হকীম য়ুসূফ ঝুঁঝুনওয়জির বই 'ঝুঁঝুনূঁ কা ইতিহাস'-এ এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। জয়সলমেরের পুরোনো নথিতেও হাকড়ো শব্দ স্থান পেয়েছে। দেবীসিংহ মান্ডওয়া-র বই 'শার্দুলসিংহ সেখাওত', শ্রীপরমেশ্বর সোলাঙ্কির-র বই 'মরুপ্রদেশকা ইতিবৃত্তাত্মক বিবেচন (প্রথম খণ্ড)', বই দুটিও এখানে যে সমুদ্র ছিল সে বিষয়ে অনেক তথ্য দিয়ে থাকে। এখানে পাওয়া জীবাশ্মগুলিও এর আরও একটি প্রমাণ। তাছাড়াও রয়েছে জনসাধারণের মনে ভেসে বেড়ানো নামগুলি এবং তার সঙ্গে যুক্ত লোকগাথাগুলি।

পুরোন ডিঙ্গল ভাষায় সমার্থক শব্দের বিভিন্ন অভিধানে ঢেউয়ের মতই সমুদ্রের নাম পাওয়া যায়। অধ্যায়ে এগারোটি নাম দেওয়া হয়েছে, পাঠক ইচ্ছে করলে সেখানে এগুলিও জুড়ে নিতে পারেন :

সমুন্দ্রা কৃপার অঁবধি সরিতাঁপতি (অখ্যঁ)
পরাওয়ারাঁ পরঠি উদধি (ফির) জলনিধি (দখ্যঁ)।
সিন্ধু সাগর (নাঁম) জাদপতি জলপতি (জপ্পঁ),
রতনাকর (ফির রটহু) খীরদধি লওয়ন (সুপপ্পঁ)।
(জিণ ধাঁম নাঁম জজাঁল জে সটমিট জায় সঁসার রা,
তিণ পর পাজাঁ বঁধিয়াঁ ও তিণ নাঁমাঁ তার রা)॥

এই নামগুলি কবি হররাজের রচিত ডিঙ্গল নামমালা থেকে নেওয়া হয়েছে। কবি নাগরাজ পিঙ্গল, তার 'নাগরাজ ডিঙ্গল' অভিধানে সমুদ্রের নামগুলি এই ভাবে বর্ণনা করেছেন :

উদধ অঁব অণথাগ অচ উধারণ অলিয়ল,
মহণ (মীন) মহরাঁণ কমল হিলোহল ওয়্যাকুল।
বেলাওল ওহিলোল ওয়ার ব্রহমগু নিধুওয়র,
অকুপার অণথাগ সমন্দ দধ সাগর সায়র।
অতরহ অমোধ চড়তও অলীল বোহত অতেরুডুবওণ,
(কব কবত ওহ পিঙ্গল কহৈবীস নাঁম) সামন্দ (তণ)॥

কবি হমীরদান রতনু রচিত হমির নামমালায়, সমুদ্রের নামের মালায় আরও কয়েকটি নতুন নাম জুড়ে দেন :

মথণ মহণ দধ উদধ মহোদর,
রেণয়র সাগর মহরাঁণ
রতনাগর অরণও লহরীরও,
গৈডীরও দরীআও গম্ভীর।
পারাওয়ার উধধিপত মছপতি,
(অথগ অম্বহর অচল অতীর)॥
পতিজল পদমালয়াপিত।
সরসওয়ান সামন্দ,
মহাসর অকৃপার উদভব-অম্রতি ॥

এর পরও যে দু-চারটে নাম এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থেকে যায় কবিরাজ

মুরারিদান সেগুলি একত্রিত করেছেন :

সায়র মহরাণ স্রোতপত সাগর দধ রতনাগর মগণ দধী,
সমন্দ পয়োধর বারধ সিন্ধু নদীঈসবর বানরথী।
সর দরিয়াব প্রয়োনধ সমদর লখমীতাত জলধ লওয়ণোদ,
হীলোহল জলপতী বারহর পারাওয়ার ওদধ পাথোদ।
সরতঅধীস মগরঘর সরবর অরণও মহাকচ্ছ অকুপার,
কলব্রছপতা পয়ধ মকরাকর (ভাখাঁ ফির) সফরীভণ্ডার॥

জলের থেকে বেরিয়ে আসা মরুভূমির হৃদয় এই ভাবে সমুদ্রের এত নাম এখনও স্মরণে রেখেছে এবং সেই সঙ্গে তারা এটাও বিশ্বাস করে যে মরুভূমি আবার একদিন সমুদ্রে পরিণত হবে :

হক কর বহসে হাকড়ো .বন্ধ তুট সে অরোড়
সিন্ধড়ি সুখো জাওসী, নির্ধনিয়ো রে ধন হোওসী
উজড়া খেড়া ফির বসসী, ভাগিয়ে রে ভূত কমাওসী
ইক দিন এয়সা আওসী।

হাকড়ো পরবর্তী সময় সমুদ্র থেকে দরিয়াব, দরিয়াব থেকে দরিয়া অর্থাৎ নদী হয়ে যায়। এই এলাকারই লুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রাচীন নদী সরস্বতীর সঙ্গে তখন হাকড়োকে এক করে দেখা হত। আজ এই এলাকায় মিষ্টি ভূ-জলের ভাণ্ডার যথেষ্ট ভাল বলে স্বীকৃত হয়েছে। আর একে ঐ নদীগুলিরই চুঁইয়ে আসা জল বলে মনে করা হয়। রাজস্থানের সীমানা পার করে পাকিস্তানের সখ্খর জেলাতে অরোড় নামক স্থানে একটা বাঁধ রয়েছে; একদিন এমন আসবে যেদিন বাঁধটি ভেঙে যাবে। সিন্ধু শুকিয়ে যাবে, ভরভরন্ত গ্রামগুলি উজাড় হয়ে যাবে, উজাড় হয়ে যাওয়া গ্রামগুলি আবার ফিরে বসতি স্থাপন করবে, ধনী নির্ধন হবে, নির্ধন ধনী হবে একদিন এমনই আসবে।

হাকড়োর প্রারম্ভিক তথ্য ও রাজস্থানীতে সমুদ্রের কিছু নাম আমরা পাই শ্রীবদরীপ্রসাদ সাকরিয়া ও শ্রীভূপতিরাম সাকারিয়া সম্পাদিত রাজস্থানী হিন্দি শব্দকোষ, পঞ্চশীল প্রকাশন জয়পুর থেকে। তবে আমাদের এটি ঠিকঠাক বোধগম্য হয় শ্রীদীনদয়াল ওঝা (কেলাপাড়া জয়সলমের)এবং শ্রীজেঠুসিং ভাটি (সিলাওটপাড়া জয়সলমের)-র সঙ্গে হওয়া কথা বার্তায়। 'ইক দিন এয়সা আওসী' সময়ের অপেক্ষায় গাওয়া এই গাঁথাটিও শ্রীজেঠুর কাছেই পাই। ডিঙ্গল ভাষায় সমুদ্রের নামগুলি পাই, নারায়ণ সিং ভাটি সম্পাদিত রাজস্থানী গবেষণা কেন্দ্র চৌপাসনি, যোধপুর থেকে ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত ডিঙ্গল কোষ থেকে।

রাজ্যের বর্ষার পরিসংখ্যান রাজস্থানি গ্রন্থাগার যোধপুর থেকে প্রকাশিত শ্রীইরফান মেহর-এর বই 'রাজস্থান কা ভূগোল' থেকে পাই । রাজস্থানের বিভিন্ন জেলায় গড় বৃষ্টিপাতের পরিসংখ্যানটি নিম্নরূপ :

জেলা	গড় বৃষ্টিপাত(সেমি)	জেলা	গড় বৃষ্টিপাত(সেমি)
জয়সলমের	১৬.৪০	আলওর	৬১.১৩
শ্রীগঙ্গানগর	২৫.৩৭	টোঁক	৬১.৩৬
বিকানের	২৬.৩৭	উদয়পুর	৬২.৪৫
বাড়মের	২৭.৭৫	সিরোহি	৬৩.৮৪
যোধপুর	৩১.৮৭	ভরতপুর	৬৭.১৫
চুরু	৩২.৫৫	ধোলপুর	৬৮.০০
নাগৌর	৩৮.৮৬	সওয়াইমাধোপুর	৬৮.৯২
জালৌর	৪২.১৬	ভিলওয়াড়া	৬৯.৯০
ঝুঁঝনু	৪৪.৪৫	ডুঙ্গরপুর	৭৬.১৫
সিকর	৪৬.৬১	বুঁদি	৭৬.৪১
পালি	৪৯.০৪	কোটা	৮৮.৯২
আজমের	৫২.৭৩	বাঁসওয়াড়া	৯২.২৪
জয়পুর	৫৪.৮২	ঝালওয়াড়া	১০৪.৪৭
চিতোরগড়	৫৮.২১	নতুন জেলাগুলির পরিসংখ্যন পাওয়া যায় নি।	

সারা বছরে মাত্র ১৬.৪০ সেন্টিমিটার বৃষ্টি হয় যে জয়সেলমেরে সেই জয়সলমের দীর্ঘ সময় ইরান, আফগানিস্থান থেকে রাশিয়া পর্যন্ত ব্যাবসার কেন্দ্রবিন্দু ছিল । আর এই ব্যাবসায়িক কারণে জয়সলমেরের ছবি পৃথিবীর মানচিত্রে কত উজ্বল ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় – 'জয়সলমের খাদি গ্রামোদ্যোগ পরিষদ' ভাণ্ডারের দেওয়ালে টাঙানো এক মানচিত্রে। তখন কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজের নাম গন্ধও ছিল না।

মরুনায়ক শ্রীকৃষ্ণের মরু যাত্রা ও বরদানের বিষয়টি, আমরা প্রথম দেখি শ্রীনারায়ণপাল শর্মা-র বইতে।

থর রাজ্যের পুরোনো নামে মরুমেদনী, মরুধন্ব, মরুকান্তার, মরুধর, মরুমণ্ডল এবং মারও- এর মতো নাম অমর কোষ, মহাভারত, প্রবন্ধ চিন্তামণি, হিতোপদেশ, নীতিশতক, বাল্মীকি রামায়ণ প্রভৃতি সংস্কৃত বই গুলিতে পাওয়া যায় এবং এগুলি মরুভূমির অর্থে কম বরং নির্মল এক আঞ্চল হিসেবেই বেশি অর্থে এসেছে।

মাটি, জল ও তাপের তপস্যা

মেঁঢক ও বাদলের প্রসঙ্গ সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। তবে এখানে ডেডরিয়া, মেঁঢক মেঘ দেখে শুধু ডর্র ডর্র-ই করে না। সে মনে মনে পালর পানি সংগ্রহ করে রাখার সেই বাসনাই পোষণ করে যে বাসনা আমরা সমস্ত রাজস্থানের হৃদয়েই দেখতে পাই। আর এই যে মেঁঢক, যাকে মনে হয় সাধারণ, যে দেখতেও সাধারণ, সে কত জল ধরে রাখতে চায়? এতটাই, যেন পুকুরের নেষ্টা অর্থাৎ অপরা অর্ধেক রাত বয়ে চলে। পুকুর কানায় কানায় ভরে ওঠে।

ডেডরিয়োর তৃতীয় লাইন গাইবার সময়, তলাই শব্দটির বদলে বাচ্চারা নিজেদের পাড়ার বা গ্রামের পুকুরের নাম বসিয়ে নেয়। কোন জায়গায় দ্বিতীয় লাইন গাওয়ার সময়ও, পালর পানি ভঁরু-ভঁরু-র বদলে, মেঁঢক ঠালা ঠিকর ভঁরু-ভঁরু গাওয়া হয়।

ডেডরিয়োর প্রসঙ্গে তথ্যগুলি আমরা জয়সলমেরের শ্রীজেঠুসিং ভাটির কাছে পাই। এতে আরও কিছু সংযোজন করেন জয়সলমেরেরই শ্রীদীনদয়াল ওঝা— মেঘ ঘন হয়ে এলে ছোটরা বেরিয়ে পড়ে ডেডরিয়ো গাইতে। বড়রা তখন মাটির পাত্রে গুগরি চড়ায়। জল ও হাওয়ার উদ্দেশে অর্ঘ্য অর্পণ করে গুগরি চারি দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এভাবে বর্ষার অভিমান ভাঙানো হয়। অর্থাৎ বর্ষা যদি কোনো কারণে রুষ্ট হয়ে থাকে, তাই তাকে প্রসন্ন করার জন্য অর্ঘ্য। খালি মাথায় সারতে হয় এই অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের সময় পাগড়ি নিসিদ্ধ। জলদেবতাকে বোঝাতে হবে তো যে, তারা দুখী-সন্তপ্ত। শোকাচ্ছন্ন ভক্তদের প্রসন্ন করতে নিজের রাগ অভিমান ভুলে বর্ষাকে নেমে আসতেই হয়।

কোথাও কোথাও 'আখা তিজ', অর্থাৎ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন চারটে ছোট ছোট গোল মাটির পাত্র তৈরি করে ভূমির ওপর রাখা হয়। চারটি পাত্রকে— জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র এই চার মাসের প্রতীক মনে করা হয়। এবার পাত্রগুলি জলপূর্ণ করা হয়। কৌতূহলী দৃষ্টি অপেক্ষা করে কোন পাত্রটি মাটি প্রথমে গলছে(দ্রব হওয়া)। যদি জ্যৈষ্ঠেরটি প্রথমে গলে তাহলে বর্ষা যেমন হয় তেমনই হবে বলে মনে করা হয়, আষাঢেরটা গললে খণ্ডিত বর্ষা, আর শ্রাবণ বা ভাদ্ররটা যদি প্রথমে গলে তাহলে বৃষ্টি হবে প্রচুর।

আধুনিক মানুষদের কাছে চার মাসের এই চারটি পাত্র টোটকা হতে পারে কিন্তু এখানকার পুরোনো লোকেরা আবহাওয়া দপ্তরের ভবিষ্যত্বাণীকেও টোটকার থেকে বেশি কিছু মনে করে না।

বর্ষাকালে বিদ্যুতের ঝলকানি, মেঘের গর্জনের ধ্বনি ও আলোর গতির সঠিক স্বভাবটি সমাজ পর্যবেক্ষণ করে এসেছে : 'তিস কেসরি গাজ, শ কেসরি খৈন'। অর্থাৎ বজ্রপাতে মেঘের গর্জন তিরিশ ক্রোশ যায় কিন্তু তার বিদ্যুতের চমক একশো ক্রোশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। শব্দ ও আলোর এই তফাতের নিয়ম আমরা জানতে পারি জেঠুসিং-এর কাছে।

রাজ্যের বিস্তার, ক্ষেত্রফল প্রভৃতি পরিসংখ্যানগুলির জন্য ইরফান মেহরের বই 'রাজস্থান কে ভূগোল'-এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এতে নতুন জেলাগুলিও অবশ্য যোগ করা হয়েছে। রাজস্থানের ভূগোলের আধুনিক বর্গীকরণ ও মৌসুমীবায়ুর বিস্তৃত পরিচয়ও এই বইটি থেকেই নেওয়া হয়েছে।

লবণাক্ত জমির পরিচয় আমরা প্রথম পাই সাম্ভর এলাকায় গিয়ে। সাম্ভর এলাকা পর্যন্ত আমরা পৌঁছাতে পারি তিলেনিয়া, আজমের স্থিত সোশ্যাল ওয়ার্ক এন্ড রিসার্চ সেন্টারের সাথী শ্রীলক্ষীনারায়ণ, শ্রীলক্ষণসিংহ ও শ্রীমতী রতনদেবীর সৌজন্যে। বিকানেরের লুনকরসর তো নামেই লবণ যুক্ত রয়েছে। এই এলাকাটিকে বুঝে নিতে আমাদের সাহায্য করেছে উরমুল ট্রাস্ট; যারা ওখানে কাজ করছে।

এই অধ্যায়ের তাপের সঙ্গে সম্পর্কিত অংশ পিথ, জলকুন্ডি, মাছলো ও ভডলি পুরাণ -এর প্রারম্ভিক সূচনা শ্রীবদরিপ্রসাদ সাকরিয়া ও শ্রীভূপতিরাম সাকরিয়ার রাজস্থানি শব্দকোষ থেকে পাওয়া গেছে। বর্ষাসূচক চাঁদের 'উভো' অথবা 'সুতো' স্থিতি আমাদের বুঝিয়েছেন শ্রীদীনদয়াল ওঝা ও শ্রীজেঠুসিং। ডঙ্ক-ভডলি পুরাণে বর্ষা সম্পর্কিত অন্যান্য কয়েকটি প্রবাদ হল :-

মঙ্গসর তনি জে অষ্টমি, বাদলি, বিজ হোয় ।
সাঁওন বরষে ভডলি, সাখ সওয়াই জোয় ॥

যদি মার্গশীর্ষের (অগ্রহায়ণ মাস) কৃষ্ণা অষ্টমী-তে মেঘ ও বিদ্যুৎ দুইই থাকে তাহলে শ্রাবণে বর্ষা হবে এবং ফসল সাধারণ ভাবে যা হয় তার এক চতুর্থাংশ বেশি হবে।

মিঁগসর বদ ওয়া সুদ গঁহি, অধৈ পোহ উরে ।
ধংওয়ারা ধুঁধ সমায়ে দে (তৌ) সমিয়ৌ হোয় সিরে ॥

যদি অগ্রহায়ণের প্রথম বা দ্বিতীয় পক্ষে অথবা পৌষের প্রথম পক্ষে সকালে কুয়াশা হয় তাহলে বর্ষা ভাল হবে।

পৌষ আধাঁরি দশমি, চমকৈ বাদল বীজ।
তৌর ভর বরষৈ ভাদবৌ, সায়ধন খলৈ তিজ ॥

যদি পৌষ কৃষ্ণা দশমীর বৃষ্টিতে বিদ্যুত চমকায়, তাহলে পুরো ভাদ্র ভর বৃষ্টি হবে।

এবং স্ত্রীরা তিজ উৎসব ভালভাবেই করতে পারবে ।

পোহ সবিভল পেখজৈ, চৈত নিরমল চঁন্দ।
ডঙ্ক কহ হে ভড়ড, মন হুঁতা অন চন্দ ॥

যদি পৌষে ঘন মেঘ দেখা যায় ও চৈত্রের শুক্ল পক্ষে চাঁদ স্বচ্ছ দেখা যায়, অর্থাৎ আকাশে মেঘ না থাকে তাহলে আনাজ টাকা মন-এর থেকেও সস্তা হবে।

ফাগন ওয়দি সু দুজ দিন, বাদল হোঁয়ে ন বিজ ।
বরষে শাঁওন ভাদয়ৌ, সাজন খেলৌ তিজ ॥

যদি ফাল্গুন কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার দিন বৃষ্টি না হয়, বিদ্যুৎ না চমকায় তাহলে শ্রাবণ ও ভাদ্রে ভালো বর্ষা হবে। অতএব হে স্বামী, তিজ ভালোভাবে পালন করো।

বৃষ্টি যেখানে সব থেকে কম, সেখানে বৃষ্টির সব থেকে বেশি নাম পাওয়া যায়। এই লম্বা তালিকার প্রায় চল্লিশটি নামের প্রথম ঝাপটা আমরা রাজস্থানি-হিন্দি শব্দকোষের সাহায্যে করতে পেরেছি। বিভিন্ন ডিঙ্গল শব্দকোষ থেকে আরও কিছু নাম এতে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে। কবি নাগরাজের ডিঙ্গলকোষ মেঘের নাম গুণে থাকে নিম্ন রূপে :

পাওয়স প্রথবিপাল বসু হব্র বৈকুণ্ঠবাসী,
মহিরঞ্জণ অম্ব মেঘ ইলম গাজিতে - আকাসী ।
নৈণে -সঘণ নভরাট ধ্রওয়ন পিঙ্গল ধরাধর,
জগজীবন জীমূত জলঢ় জলমন্ডল জলহর।
জলওয়হণ অভ্র বরসন সুজল মহত কলায়ন (সুহামনা), পস্জন্য মুদির পালগ ভরণ (তীস নাম) নীরদ (তণা)॥

শ্রীহমিরদান রতনু বিরচিত হামির নামমালায় মেঘের নামের যে ছটা পাওয়া যায় তা-

পাওয়স মুদর বকাহক পালগ,
ধরাধর (ওয়ালি) জলধরন।
মেঘ জলদ, জলবহ জলমন্ড,
ঘন জগজীবন ঘণাঘণ॥
তড়িতওয়ান তোঈদ তনয়ন্তু,
নীরদ ওয়ারসন ভরন -নিওয়ান।
অভ্র পরজন নভরাট আকাসি,
কাঁমুক জলমুক মহত কিলাঁণ
(কোটি সঘন ,সোভা তন কাঁম্বড়,
স্যাঁম ত্রেভূঅণ স্যাম সরীর।

লোক মান্হি জম জোর ন লাগৈ,
হাথি জোড়ি হরি সমর হমীর)॥

শ্রীউদয়রাম বারহঠ বিরচিত অবধান-মালাতে বাকি নামগুলি সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে এই ভাবে :-

ধারাধর ঘণ জলধরণ মেঘ জলদ জলমণ্ড,
নীরদ বরসণ ভরণনদ পাওয়স ঘটা (প্রচণ্ড)।
তড়িতওয়ান তোয়দ তরজ নিরঝর ভরণনিওয়াণ,
মুদর বলাহক পালমহি জলদ (ঘণা) ঘণ (জাঁণ)।
জগজীওয়ন অভ্রয় রজন (হু) কাম কহমত কিলাঁণ,
তনয়তু নভরাট (তব) জলমুক গয়ণী (জা, ণ)॥

ডিঙ্গল অভিধানের অন্য এক তালিকায়, যেখানে কবির নাম পাওয়া যায় না, সেখানে বৃষ্টির আরও কিছু নাম পাওয়া যায় :-

মেঘ জলদ নীরদঁ জলমণ্ডণ,
ঘণ বরষণ নভরাট ঘণঘণ।
মহত কিলাণঁ আকাসী জলমুক,
ধারাধর পাওস অভ্র জলভুর,
পরজন ! তড়িতওয়াঁন তোয়দ (পর) সঘণ তনয় (তু) স্যমঘটা (সজি),
গঁজণরোর নিওয়াঁণভর গজি।

কবিরাজ মুরাদিদানের রচিত তালিকাও ঘন কালো মেঘের মতোই ছেয়ে রয়েছে। তবে এখানে এসেও আমরা দাঁড়াতে পারি।

মেঘ ঘনাঘন ঘণ মুদির জীমুত (র) জলওয়াহ,
অভ্র বলাহক জলদ (অখ) নমধুজ ধূমজ (নাহ)॥

ডিঙ্গল অভিধানের এই তথ্য আমরা পাই শ্রীনারায়ণসিংহ ভাটি সম্পাদিত, রাজস্থানি গবেষণা কেন্দ্র চৌপাসনি, যোধপুর থেকে ১৯৫৭-তে প্রকাশিত ডিঙ্গল অভিধানে।

বৃষ্টির স্বভাব, রঙ্গ, রূপ, তাকে এক দিক থেকে অন্য দিকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া, কোনো পাহাড়ের ওপর তার একটুখানি বিশ্রাম করে নেওয়া প্রভৃতির প্রারম্ভিক তথ্য রাজস্থানী হিন্দি অভিধান থেকে নেওয়া হয়েছে।

আজকের জমানাতেও আমরা 'জামানো' শব্দটির অর্থ ঠিক-ঠাক ভাবে বুঝতে পারি, জনসত্তার সম্পাদক শ্রীওমথানবি-র কাছে। তাঁর ঠিকানা হল - ১৮৬ বি, ইন্ডাসট্রিয়াল এরিয়া, চন্ডীগড়। শ্রীথানবি ১৯৮৭ সালে সেন্টার ফর সায়েন্স এন্ড এনভায়রনমেন্ট,

নতুন দিল্লি -র একটি ফেলোসিপে রাজস্থানের জল সংগ্রহ বিষয়ে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ লেখেন এবং সেই ঐতিহ্যের দৃষ্টান্তগুলি তুলে ধরার জন্য কিছু ছবিও তোলেন। জ্যৈষ্ঠের প্রশংসায় গোয়ালাদের গান, এবং মাসেদের পারস্পরিক কথাবার্তায় জ্যৈষ্ঠের শ্রেষ্ঠতার গল্প, বৃষ্টির ক্রিয়াকলাপ তুঠনো থেকে শুরু করে উবরেলো অর্থাৎ বর্ষার জল সংগৃহীত করার পুরো প্রক্রিয়াটি আমরা বুঝতে পারি রাজস্থানি-হিন্দি শব্দকোষ থেকে।

রাজস্থানের রজতবিন্দু

সত্যি সত্যি কুঁই জিনিসটা যে কী সেটা খানিকটা বুঝতেই আমাদের 'নেতি নেতি'-র মতোই সাত আট বছর লেগে গেছে এবং তা স্বীকার করতে আমাদের বিন্দুমাত্র সংকোচ হচ্ছে না। প্রথমবার কুঁই দেখি ১৯৮৮ সালে চুরু জেলার তারানগর এলাকায়। কিন্তু কুঁই কীভাবে তার কাজ করে যায়, নোনতা জলের মাঝে দাঁড়িয়েও কীভাবে মিষ্টি জল দেয় – এর প্রাথমিক পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম প্রৌঢ় শিক্ষণ সমিতির এক গোষ্ঠীতে যোগ দিতে আসা গ্রামীণ প্রতিনিধিদের সঙ্গে হওয়া কথাবর্তায়। বাড়মেরে যে পারগুলি তৈরি হয়েছে সেগুলির পরিচয় আমরা পাই সেখানকার নেহেরু যুবক কেন্দ্রের কার্যনির্বাহক শ্রীভুবনেশ জৈন -এর কাছে।

শ্রীকিশান বর্মা কোনো এক সময় নিজেই গজধর ছিলেন। তিনিই আমাদের বুঝিয়েছেন চেজারো ও চেলওয়াজিদের কাজের সূক্ষ্মতা ও কঠিনতা। কুঁই খোঁড়ার সময় ভেতরে হাওয়ার অভাব দূর করতে জোরে জোরে মুঠোভর্তি বালি ছোঁড়া এবং খিঁপ দড়ি দিয়ে কুঁইকে বাঁধার আশ্চর্যজনক নিয়মও তিনিই আমাদের বলেন। শ্রীবর্মার ঠিকানা, ১, গোল্ডেন পার্ক, রামপুরা, দিল্লি ৩৫।

জয়সলমেরের শ্রীজেঠুসিং ভাটির সঙ্গে পত্রালাপে এবং পরে জয়সলমেরে তার সঙ্গে আলাপচারিতায় আমরা বুঝতে পারি কুঁই ও রেজানি পানির শাশ্বত সমন্ধের বিষয়টি। 'বিট্টু রো বিল্লিয়ো'-র কারণেই রেজানি পানি ঠিক মতো সঞ্চিত থাকে। বিট্টু মুলতানি মাটি বা মেট, ছোট ছোট কাঁকর, অর্থাৎ মুরডিওর সঙ্গে মিলেমিশে তৈরি এক প্রকার স্তর। এতে জল আর্দ্ররূপে অনেকদিন পর্যন্ত কোথাও কোথাও এক-দু বছর পর্যন্ত টিঁকে থাকে। খড়িয়া পাথরের স্তরও এই একই কাজ করে কিন্তু এতে জল অত দীর্ঘ দিন পর্যন্ত টিঁকে থাকে না। বিট্টুর ঠিক বিপরীত হল 'ধীয়ে রো বিল্লিয়ো'। এতে জল স্থির হতে পারে না এবং তাই এই এলাকায় রেজানি পানি সংগ্রহ করা যায় না আর তাই এখানে

কুঁইও তৈরি করা যায় না।

সাঁপণী ও লরা দিয়ে পার বাঁধাইয়ের তথ্যও আমরা ওনার কাছেই পাই। জয়সলমের থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দূরে 'খড়েরো কী ঢাণি' গ্রামে পালিওয়ালদের ছয় বিশী (একশো কুড়ি) পারগুলিকে বুঝতে পারি শ্রীজেঠুসিং এবং ঐ গ্রামেরই শ্রীচৈনারামজির সঙ্গে যাবার সময়; কিন্তু পারগুলি আজ বেশিরভাগই বালির তলায় চাপা পড়ে গেছে। আরও একটি গ্রাম হল ছঁতারগড়। এখানে পালিওয়ালদের সময়ের তিনশোরও বেশি কুঁই-এর অবশিষ্টাংশ এখনও পাওয়া যায়। অনেকগুলি পারেই এখনও জল রয়েছে। 'খড়েরো কী ঢাণি'-র মতো অনেক গ্রামেই আজ নতুন বসানো টিউবওয়েলের পাওয়া যাচ্ছে। ষাট কিলোমিটার দূর থেকে পাইপলাইনে জল আসছে। টিউবওয়েল যেখানে খোঁড়া হয়েছে সেখানে ইলেকট্রিক নেই। ডিজেল ব্যবহার হচ্ছে। আবার ডিজেল আসছে ট্যাংকারে করে দূর কোনো জায়গা থেকে। কখনও ট্যাংকারের ড্রাইভার ছুটি নেয়, কখনও পাম্প যে চালায় সে। কখনও ডিজেল পাওয়া যায় না, আবার পাওয়া গেলে তা চুরিও হয়। কখনো রাস্তায় পাইপ লাইন ফেটে যায়। এই রকম বহু কারনেই এই সমস্ত গ্রামগুলিতে জল পৌঁছায় না। নতুন তৈরি জলের টাঙ্কিগুলি খালি পড়ে থাকে আর গ্রামের লোক পারগুলি থেকেই জল নেয়।

জল দেওয়ার এইরকম সরকারি পরিষেবা যেসমস্ত গ্রামগুলিতে দেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে সেগুলির নিয়মিত খবর রাখা দরকার রাজস্থানের সংস্থাগুলির ও খবর কাগজগুলির। নতুন মাধ্যমে জল আসছে, কী পরিমাণে আসছে,তা প্রচার হওয়া প্রয়োজন। তাহলেই বোঝা যাবে যে, যে পদ্ধতিগুলিকে আধুনিক বলা হচ্ছে সেগুলি মরুভূমিতে কতটা পিছিয়ে পড়া বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

ইন্দিরা গান্ধী নহরের আওতায় আনা হয়েছে যে গ্রামগুলিকে সেগুলিরও হাল একইরকম হতে চলেছে। এর আগে এ গ্রামগুলি কুঁই থেকেই তাদের পানীয় জল পেত। চুরু জেলার বুচাওয়াসা গ্রামে প্রায় পঞ্চাশটিরও বেশি কুঁই ছিল। সন্ধেবেলা একসঙ্গে সারা গ্রাম এখানে জমা হত জল নেওয়ার জন্য। যেন মেলা লেগে যেত। এখন নতুন পদ্ধতিতে দূর থেকে পাইপলাইনে বয়ে জল সিমেন্টের এক বড় গোল ট্যাংকে আসে। তার চারদিকে নল লাগানো। এই নতুন ব্যবস্থায় মেলা নয় ,ভীড় লেগে যায়। ঝগড়া হয়। কলসি ভাঙ্গে। ট্যাংকে প্রতিদিন জল আসে না। কখনও কখনও তো সপ্তাহ দু-সপ্তাহে এক -দুবারই জল আসে। তাই জল নেওয়ার জন্য হুড়ো-হুড়ি লেগে যায়। গ্রামের মাস্টারমশাই-এর বক্তব্য হল 'যদি প্রতিদিনের গড় নির্ণয় করা যায় তাহলে দেখা যাবে, সম্ভবত ততটাই জল পাওয়া যায়, যতটা বিনা ঝগড়ার কুঁইয়ে পাওয়া যেত। এর মাঝে

নষ্ট হয়ে যাওয়া কিছু কুঁই আবার ঠিকঠাক করা হচ্ছে।

কুঁইগুলি সত্যি সত্যি স্বয়ংসিদ্ধ ও সময়সিদ্ধ প্রতিপন্ন হচ্ছে।

থেমে থাকা জল নির্মল

প্রবাহিত জলকে সঞ্চয় করে সারাবছর নির্মল করে রাখতে পারে যে কুণ্ডিগুলি, সেগুলি আমরা প্রথম দেখি ১৯৮৮ সালে সেন্টার ফর সায়েন্স এন্ড এনভায়রনমেন্টের শ্রীঅনিল আগ্রওয়াল এবং সুশ্রীসুনীতা নারায়ণের সঙ্গে দিল্লী থেকে বিকানের যাওয়ার পথে। কুঁইয়ের মতো এগুলিকেও বুঝতে আমাদের অনেক সময় লেগেছে।

কুণ্ডি শব্দ কুণ্ড থেকে এবং কুণ্ড, যজ্ঞকুণ্ড থেকে এসেছে বলে মনে করা হয়। জয়সলমের জেলাতে অনেক পুরোনো বৈশাখী কুণ্ডও আছে; যেখানে আশপাশের অনেক বড় এলাকা থেকে মানুষ অস্থি বির্সজন দিতে আসে। বলা হয় বৈশাখী পূর্ণিমায় স্বয়ং গঙ্গা এখানে বিরাজিত হন। এই লোককথাগুলি কুণ্ডের জলের নির্মলতা ও পবিত্রতারই পরিচয় দেয়।

কুণ্ড তৈরির প্রথা কত পুরোনো তা সঠিক বলা যায় না। বিকানের-জয়সলমের এলাকায় দুশো-তিনশো বছরেরও পুরোনো কুণ্ড, টাঁকা পাওয়া যায়। নতুন পদ্ধতির হ্যান্ডপাম্পগুলিকেও সচল রেখেছে এমন কুণ্ডও চুরু এলাকায় অনেক আছে। কুণ্ডিগুলির সময়সিদ্ধ-সমাজসিদ্ধ বৈশিষ্ট্যটি আমাদের বুঝিয়ে ছিলেন জনসত্তা, দিল্লির শ্রীসুধীর জৈন।

বিকানের জেলার সীমানার মধ্যে পাকিস্তানের গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জালওয়ালি গ্রামের ফোগের ডাল দিয়ে তৈরি কুণ্ডিগুলি আমরা দেখতে পাই শ্রীওম থানবি ও রাজস্থান গো সেবা সঙ্ঘের শ্রীভম্বরলাল কোঠারিজি-র সৌজন্যে। কুণ্ডিগুলিকে সাদা রং করার কারণ এবং রহস্যও আমাদের বোঝান শ্রীওম্ থানবি।

খড়িয়া পাথর দিয়ে তৈরি কুণ্ডগুলি বিকানের ও জয়সলমেরের সংযোগকারী রাস্তার ওপর মাঝে মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বজ্জু এলাকাতেও আমরা এই ধরনের কুণ্ড দেখি, উরমূল ট্রাস্টের শ্রীঅরবিন্দ ওঝার সঙ্গে যাবার সময়। রাজস্থানের গো সেবা সঙ্ঘের শ্রীজগদীশজি-র সঙ্গে যাবার সময় আমরা রামগড় এলাকায় দেখতে পাই শিল্প হয়ে ওঠা বারান্দার মতো কুণ্ডিগুলি। এই কিছুদিন আগে জয়সলমেরে একটা সম্পূর্ণ নতুন গ্রাম গড়ে উঠেছে 'কবীর বস্তি'। এই গ্রামটিতে প্রতিটি ঘরের সামনে এই রকম কুণ্ডি তৈরি করা হয়েছে। এই তথ্য আমরা পাই জয়সলমের গ্রামোদয় পরিষদের শ্রীরাজু প্রজাপত-

এর কাছে। শ্রীওম থানবির সৌজন্যে, যোধপুরের ফলৌদি শহরে, ছাত ও উঠোনের আগৌর জুড়ে দ্বিগুণ জল সংগৃহীত হওয়া টাঁকাগুলি আমরা দেখতে পাই। 'চুররোর' জল যত্ন সহকারে গ্রহণ করে যে টাঁকাগুলি, সেগুলির পরিচয় আমাদের দেন শ্রীজেঠুসিং ভাটি। জয়সলমেরের নরসিংহ ঢাণির (আট-দশটা গ্রাম নিয়ে গড়ে ওঠা ছোট গ্রাম)র কাছাকাছি এই রকম একটি টাঁকা তৈরি করেন শ্রীসন্তোষপুরী নামের এক সাধু। সন্ন্যাস নেওয়ার আগে ইনি পশু চরাতেন। এই এলাকার বৃষ্টির জলকে তিনি বয়ে যেতে দেখেছেন। তাই সাধু হওয়ার পর তিনি মনে করেন এই জল ব্যবহার হওয়া দরকার। তিনি যে কাজ শেষ করে যেতে পারেননি তাঁর শিষ্যরা এখন তা করছে। সংসার ছেড়ে দেওয়া সন্ন্যাসী জলের কাজকে কত আধ্যাত্মিকভাবে নিজের করে নিয়েছেন তার বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যেতে পারে শ্রীজেঠুসিং এর কাছে।

জয়গড় কেল্লার প্রাথমিক তথ্য আমরা পাই, জয়পুর শহরের সংগ্রহশালায় লাগানো একটা বিজ্ঞাপন থেকে। ঐ বিজ্ঞাপনটিতে এটিকে বিশ্বের সব থেকে বড় টাঁকা বলা হয়েছিল। পরে আমরা 'চাকসু'-র সংস্থা এগ্রোএক্সন-এর শ্রীশরদ জোশীর সঙ্গে এখানে যাই। এবং তার কাছেই প্রারম্ভিক তথ্য পাই। সব থেকে বড় এই টাঁকাটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় হল এই রকম :

জয়গড় পাহাড়ের ওপর চার কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে টাঁকাটির আগৌর। পাহাড়ের ওপর বর্ষিত সমস্ত জলটুকুই ছোট বড় নালাগুলি দিয়ে বয়ে দুর্গের প্রাচীর পর্যন্ত আসে। নালাগুলির ঢালও এমনভাবে করা হয়েছিল যে জল যেন আস্তে আস্তে এগিয়ে চলে। এতে জলের সঙ্গে বয়ে আসা মাটি তলায় পড়ে থেকে যায়। নালার রাস্তাতেও কয়েকটা ছোট ছোট কুণ্ড করা রয়েছে। এখানেও মাটি ফেলে রেখে জল পরিষ্কার হয়ে প্রধান টাঁকার দিকে এগিয়ে চলে।

জরুরি অবস্থার সময় অর্থাৎ ১৯৭৫-৭৬ সালে সরকার এই টাঁকাতে জয়পুর রাজবংশের লুকোনো খাজানার খোঁজে প্রচুর খোঁড়াখুঁড়ি করে। এই খোঁড়খুঁড়ি কয়েক মাস ধরে চলেছিল। তিনটি টাঁকারই আশপাশে খোঁড়া হয় । টাঁকার সমস্ত জল বড় বড় পাম্প লাগিয়ে তুলে ফেলা হয়।

আয়কর বিভাগ কোন খাজানা পাক বা না পাক চারিদিকে খোঁড়া খুঁড়ির ফলে বর্ষার জল সংগ্রহের এই অদ্ভুত খাজানাটি কিছু ভেঙে-টেঙে যায়। তবুও যে প্রায় চারশো বছরের পুরোনো টাঁকাটি এই বিচিত্র অভিযানের ধাক্কা সামলে উঠে এখনও নিজের কাজ করে চলেছে এতে তার দৃঢ়তাই প্রমাণিত হয়।

এই টাঁকা অভিযান ও খোঁড়াখুঁড়ির বিস্তৃত তথ্য আর.এস খঙ্গরোত ও পি.এস

নাথাওত-এর লেখা ইংরেজি বই 'জয়গড় দা ইনবিংসিবল ফোর্ট অফ আমের'-এ পাওয়া যেতে পারে। প্রকাশক : আর.বি.এস পাব্লিসাস, এস.এম.এস হাইওয়ে, জয়পুর।

রাজস্থানে রজত বিন্দুর মতো চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা এই টাঁকা, কুণ্ডি, কুঁই, পার ও পুকুরগুলি সমাজের যে সেবা করেছে, পানীয় জলের যে জোগান দিয়েছে, আজ আমরা হিসেব করে সেই মূল্য নির্ধারণ করতে পারব না।

কোন কেন্দ্রিয় পরিকাঠামোর পক্ষে এই কাজ সম্পর্ণ করা সম্ভব নয়, যদি কিছুটা সম্ভবও হয় তাহলে তাতে খরচা হবে কয়েক কোটি টাকা। রাজস্থান সরকারের জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ মাঝে মধ্যে এখানে ওখানে পানীয় জলের পরিকল্পনা তৈরির জন্য কাগজে টেন্ডার নোটিস দিয়ে থাকে। ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লি জনসত্তা দৈনিকে প্রকাশিত এইরকম এক টেন্ডার নোটিসে বাড়মের জেলার শিব, পচপদরা, চৌহটন, বাড়মের এবং সিওয়ানা তহসিল নিয়ে মোট দুশো পঞ্চাশটি গ্রামে জলপ্রকল্প তৈরি করতে আনুমানিক লগ্নি চল্লিশ কোটি টাকা বলা হয়েছে। এই টেন্ডারে বিকানের জেলার বারোটি তহসিলে প্রায় ছশো গ্রামে কাজের জন্য ছিয়ানব্বই কোটি টাকা লাগবে।

এরই সঙ্গে ১৯৯৪-এর ফেব্রুয়ারিতে রাজস্থানের খবরের কাগজে প্রকাশিত টেন্ডারের খবরটিও লক্ষ করার মত। এটি যোধপুর জেলার ফলৌদি ক্ষেত্রে এই বিভাগের পক্ষ থেকেই পঁচিশ হাজার লিটার থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার লিটার জলধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন 'ভূতল জলাশয়' অর্থাৎ অন্য কোনো জায়গা থেকে জল এনে জমা করার ট্যাংক তৈরি করার পরিকল্পনা। এতে আনুমানিক খরচা পড়ছে তেতাল্লিশ হাজার থেকে ছিয়াশি হাজার টাকা। এতে এক লিটার জল জমা রাখতে খরচা পড়বে প্রায় দু-টাকা। এছাড়াও জল অন্য কোনখান থেকে আনতে হবে, তার খরচা আলাদা। এই কাজ ফলৌদির তেরোটা গ্রামে হবে। মোট খরচ প্রায় নয় লক্ষ টাকা। এবার কল্পনা করুন রাজস্থানের সমাজের সেই অংশটির কথা, যারা বিজ্ঞাপন, টেন্ডার, খবর, ঠিকাদার ছাড়াই নিজেদের ক্ষমতাবলে প্রায় ত্রিশ হাজার গ্রামে নির্মল জলের জোগান দিতে পারত।

বিন্দুতে সিন্ধু

এই অধ্যায়ের বেশিরভাগটুকুই 'আজ ভি খরে হ্যায় তালাব' বইয়ের 'মরীচিকাকে মিথ্যা করে পুকুর'-এই অধ্যায় থেকে নেওয়া । পুকুর কীভাবে তৈরি হয়, কারা পুকুর তৈরি করে, পুকুরের আকার প্রকার ও তার বিভিন্ন প্রকার নাম, সেই ঐতিহ্য যা

পুকুরগুলিকে দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রেখেছিল প্রভৃতি অনেক কথাই 'গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠান' থেকে ছাপা এই বইয়ে বলা হয়েছে । যাদের এই বিষয়ে আগ্রহ আছে তারা ঐ বইটিও উল্টে দেখতে পারেন। বইটির বাংলা অনুবাদও হয়েছে 'আজও পুকুর আমাদের'-এই নামে। প্রকাশক :আশাবরী, নেতাজি সুভাষ রোড, পুরুলিয়া ৭৩২১০২।

পুকুরের সব থেকে বড় কুটুমের সব থেকে ছোট ও প্রিয় সদস্য 'নাড়ি'-র প্রারম্ভিক তথ্য আমরা পাই 'মরুভূমি বিজ্ঞান বিদ্যালয়'-এর নির্দেশক শ্রীসুরেন্দ্রমল মোহনোত-এর কাছে। ইনি যোধপুর শহরে জল সংগ্রহের উন্নত ঐতিহ্যের ওপর কাজ করেছেন। তার এই অধ্যয়ন থেকে জানতে পারা যায়, শহরেও নাড়ি তৈরি হোতো। যোধপুরে এখনও কিছু নাড়ি আছে এবং এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : জোধার নাড়ি, ১৫২০ সালে তৈরি গোল নাড়ি, গণেশ নাড়ি, শ্যামগড় নাড়ি, নরসিংহ নড়ি ও ভূতনাথ নাড়ি।

সাম্বর ঝিলের আগৌরের চারদিকে নোনতা জমির মাঝে মিষ্টি জলের তলাই আমরা দেখি এবং সেটিকে বুঝতে পারি প্রযত্ন নামক সংস্থার শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ও সোস্যাল ওয়ার্ক এন্ড রিসার্চ সেন্টারের শ্রীমতীরতনদেবী তথা শ্রীলক্ষ্মণসিংহ -এর সঙ্গের যাত্রায়। এদের ঠিকানা হল : প্রয়ত্ন, গ্রাম-শোলাওয়াতা, পোঃ-শ্রীরামপুরা, ওয়রাস্তা নরৈনা, জয়পুর এবং স্যোশাল ওয়ার্ক এন্ড রিসার্চ সেন্টার, তিলোনিয়া, ওয়রাস্তা মদনগঞ্জ, আজমের।

বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আইন প্রনয়ণকারী সমাজসংস্কারক শ্রীহরবিলাস শারদা তার একটি বই 'আজমের : হিস্টোরিকাল এন্ড ডেসক্রিপ্টিভ'-এ আজমের, তারাগড়, অন্নাসাগর, বিসলগর, পুষ্কর প্রভৃতির ওপর বিস্তারিত লিখেছেন। ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে আজমেরে, অখিল ভারতীয় স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনী হয়। শ্রীহরবিলাস-ই ছিলেন প্রর্দশনী সমিতির অধ্যক্ষ। কিছু মানুষ এটা জেনে আশ্চর্য হতে পারেন যে, এই বিষয়ের ওপর প্রদর্শনীতেও আজমেরের 'অন্নাসাগর' নামক পুকুরের ওপর বিশদ তথ্য দেওয়া হয়েছিল।

এই এলাকাতেই জল ও গোচারণ ভূমি নিয়ে কাজ করছেন শ্রীলক্ষ্মণসিংহ রাজপুত। এঁর কাছেই আমরা এখানকার প্রায় সব গ্রামে বাঞ্জারাদের তৈরি তলাইগুলির তথ্য পাই এবং তার সঙ্গের যাত্রাতেই এগুলি আমরা দেখতেও পাই। এখানে এগুলিকে দন্ড-তলাই বলে। এই সব তলাইগুলির কিনারে বাঞ্জারাদের দণ্ড অর্থাৎ স্তম্ভ লাগানো রয়েছে। এই জন্যই সম্ভবত এগুলিকে এই নামে স্মরণ রাখা হয়েছে। শ্রীলক্ষণসিংহ এই রকম তলাইগুলির ভাঙা-ভাঙি সারানোরও অভিযান চালাচ্ছেন। ওঁর ঠিকানা হল : গ্রামবিকাশ নবযুবক মণ্ডল, গ্রাম-লাপোড়িয়া, বরাস্তা দুদু, জয়পুর।

জয়সলমের, বাড়মের ও বিকানের-এর পরিসংখ্যানগুলি আমরা পাই জেলা গেজেটিয়ার ও ১৯৮১ সালের জনগণনার রিপোর্ট থেকে। এতেই আমরা মরুভূমির সেই

ভয়ঙ্কর রূপ দেখি যা সমস্ত পরিকল্পনাকারীর মনে ছেয়ে রয়েছে।

শ্রীনারায়ণ শর্মার বই 'জয়সলমের' থেকে আমরা জয়সলমেরের পুকুরগুলির প্রারম্ভিক তালিকা পাই। এই বইটির প্রকাশক হল : গোয়েল ব্রাদার্স, সুরজ পোল, উদয়পুর। এর পর প্রতিবারই এই তালিকায় আরও দু-চারটে নাম যোগ হয়েছে। আজও আমরা একথা জোর করে বলতে পারি না যে শহরের পূর্ণ তথ্য বা তালিকা আমরা দিতে পেরেছি। মরুভূমির এই বৃহৎ ও সুন্দর শহরটিতে প্রতি কাজের জন্যই পুকুর তৈরি হয়েছে। বড় পশুদের জন্য তো ছিলই, বাছুরগুলোর জন্যও আলাদা পুকুর ছিল। বাছুরগুলোকে,বড় পশুদের সঙ্গে দূরে চরতে পাঠান হত না। তাই এদের জন্য শহরের কাছাকাছিই পুকুর তৈরি হত। একটা জায়গায় তিনটে তলাই একসঙ্গে ছিল। এই জায়গাটার নামই হয়ে গিয়েছিল তিনতলাই। আজ এগুলিকে বুজিয়ে দিয়ে তার ওপর ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়াম দাঁড়িয়ে রয়েছে।

জয়সলমেরের পুকুরগুলিকে বুঝতে আমরা ভীষণভাবে সাহায্য পেয়েছি শ্রীভগবানদাস মহেশ্বরী, শ্রীদীনদয়াল ওঝা ও শ্রীওম থানবি-র কাছে। ওঝাজি ও ভাটিজি সত্যি সত্যি আমাদের আঙুলে ধরে এগুলির সূক্ষ্মতা বুঝিয়েছেন।

ঘড়সিসর, গড়সিসর, গড়িসর – নাম ঘর্ষিত হয়ে চলেছে। ঘর্ষিত হতে হতে ঝক্‌-ঝক্‌ করছে। এই পুকুর মানুষের মনে সাঁতরে চলেছে। তার অনেক নাম তার অনেক রূপ। এটি জয়সলমেরের গর্বের কারণ আবার অহংকারেরও। কেউ যদি এখানে এমন কোনো বড় কাজ করে ফেলে যা হয়তো তার সামর্থের বাইরে তাহলে সেই কাজের কৃতিত্ব কর্তার বদলে ঘড়সিসরকে অর্পণ করার প্রচলন এখানে দেখা যায়, 'ঘড়সিসরে মুখ ধুয়ে এসেছো কি'? আবার যদি কেউ বড় বড় বুলি দেয় তাহলে তাকে খনিকটা নামিয়ে আনার জন্য কেউ হয়তো বলে বসল, 'যা, ঘড়সিসরে জলে একবার মুখ ধুয়ে আয়'।

মানুষ ঘড়সিসর ও তার প্রস্তুতকারক মহারাওয়ল ঘড়সিকে আজও এতটা সম্মান করে যে, যে কোনো প্রসঙ্গেই অনেক দূর থেকে মানুষ এখানে আসে নারকেল ফাটানোর জন্য। ঘড়সির সমাধি পাড়ে কোথায় আছে তা তাঁর বংশধরেরা ভুলে যেতে পারে, কিন্তু সাধারণ মানুযের তা জানা আছে। বলা হয় স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত শহরে যথেষ্ট অনুশাসন ছিল ঘড়সিসর ব্যবহারের ক্ষেত্রে। একটি বিশেষ দিন বাদ দিলে এই পুকুরে সাঁতার দেওয়া, স্নান করা বারণ ছিল। কেবল প্রথম বর্ষায় এখানে সকলের স্নানের ছাড় ছিল। বাকি সারা বছর আনন্দের একটা অংশ, স্নান ও সাঁতার-কে আটকে রাখা হত।

আনন্দের এই সরোবরে সমাজ নিজের উচ্চ-নীচ ভেদাভেদও ভুলে যায়। দূরে কোথাও মেঘ সাজতে শুরু করেছে, এটা দেখেই মেঘওয়াল পরিবারের মহিলারা নিজেরাই ঘড়সিসরের

পাড়ে চলে আসত এবং ইন্দ্রদেবকে খুশি করতে মঙ্গলগীত গাইত। না জানি কাকে কাকে খুশি করতে দেবরাজ ইন্দ্র অপ্সরাদের পাঠিয়েছিলেন এ নিয়ে অনেক গল্পই প্রচলিত আছে। কিন্তু ঘড়সিসরে খুশি করা হত স্বয়ং ইন্দ্রকে। মেঘরাওয়ল পরিবারের স্ত্রীরা এই কাজের জন্য পয়সা নিত না। কেউ তাদের এই কাজের জন্য পারিশ্রমিক বা পুরস্কার দেওয়ার সাহসও করত না। স্বয়ং মহারাওল এই কাজের জন্য তাদের প্রসাদ দিতেন। প্রসাদে থাকত পাঁচ কিলো গম ও গুড়। এগুলিও সবই পাড়েই ভাগ করে দেওয়া হত।

ঘড়সিসরে কোথা কোথা থেকে কত জল আসে তা বুঝে ওঠা পারা এক কঠিন কাজ। বালির প্রতিটি কণা যাতে আটকে যায় এবং জলের প্রতিটি বিন্দু যাতে পুকুরের দিকে বয়ে আসতে পারে, তার জন্য কয়েক মাইল লম্বা আড় (যাতে জল একদিকে বাহিত হয়ে আসে) বানানো হয়েছিল। আর পুকুরের নীচে তৈরি করা হয়েছিল অনেকগুলি কুয়ো। কোন এক সময় এই কুয়োগুলোর পর্যন্ত প্রশংসাতেও রচিত হয়েছিল সংস্কৃত ও ফার্সি কবিতা। এখন দূর থেকে পাইপে করে জল এনে ঘড়সিসরে ফেলা হয়। পাইপগুলি ভেঙে গিয়েছিল, তবে এই বিবরণ লেখার সময়ই খবর পেলাম যে পাইপগুলি সারানো হয়েছে এবং ঘড়সিসরে আবার নহরের জল আসছে। তবে পাইপলাইনের কোনো ভরসা নেই, লেখার সময় যে পাইপ ঠিক করানো হল, পড়ার সময় তা আবার ভেঙেও যেতে পারে।

বাপ-এর পুকুরগুলি দেখতে পাই বিকানের-এর সংস্থা উরমূল ট্রাস্ট-এর শ্রীঅরবিন্দ ওঝার সাহায্যে এবং গল্পটি পাই ওস্তাদ নিজামুদ্দিনের কাছে। ওনার ঠিকানা হল : বাল ভবন, কোটলা রোড, নতুন দিল্লি।

শ্রীজেঠুসিং ভাটির কাছে আমরা জসেরির যশের কথা শুনি এবং ভাটিজির সৌজন্যেই আমরা সেটি দেখতেও পাই। অন্যান্য জায়গায় দেখা যায় পুকুর শুকিয়ে গেলেও তার আশপাশের কুয়োগুলোতে জল থাকে কিন্তু এখানে আশপাশের কুয়ো শুকিয়ে যায়, কিন্তু জসেরিতে জল থাকে। এখানে কাছেই বন দপ্তরের একটা নার্সারি আছে গরমের দিনে তাদের নিজেদের জলের যে ব্যবস্থা তা যখন জবাব দেয়, তখন জসেরির জলেই তারা এই চারাগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

জসেরির জন্য মানুষের মনে অদ্ভুত এক ভালোবাসা রয়েছে। শ্রীচৈনারাম, জাতিতে ভিল। তার জীবিকা হল উটের পিঠে বা জিপে চড়িয়ে পর্যটকদের ঘোরানো, কিন্তু জসেরি যাওয়ার সুযোগ পেলে সে যে কোনো কাজ ছাড়তে রাজি। ভাঙাচোরা জসেরিকে কীভাবে ঠিক করা যায় সে ব্যাপারে সে অনেক ভাবনা চিন্তা করেছে; তবে এই সব পরিকল্পনা কোনো কাগজে নয়, সবই আঁকা রয়েছে তার রয়েছে তার মনে।

গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠান হায়দরাবাদ, ও গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠান, নতুন দিল্লি জসেরির একটি সুন্দর পোস্টার প্রকাশিত করেছে।

জল ও অন্নের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক

শ্রীকিরণ নাহটা এবং জয়সলমের খাদি গ্রামোদ্যোগ পরিষদের শ্রীরাজু প্রজাপত-এর সঙ্গে, জয়সলমেরে পালিওয়ালদের ছেড়ে দেওয়া গ্রামগুলিতে ঘোরার সময় আমরা খড়িন সম্পর্কিত প্রারম্ভিক তথ্য পাই। পরে পানি মার্চ-এর শ্রীঅরুণ কুমার ও শ্রীশুভু পটওয়ার এতে আরও কিছু তথ্য যোগ করেন। বয়োজ্যেষ্ঠ গান্ধীবাদী শ্রীভগবানদাস মহেশ্বরী জয়সলমেরের কিছু প্রসিদ্ধ খড়িনের ছবি পাঠান। এরপর বিস্তৃতভাবে এই বিষয়টি বোঝার সুযোগ হয় শ্রীদীনদয়াল ওঝা, শ্রীজেঠুসিং ও জয়সলমের জেলা খাদি গ্রামোদয় পরিষদের শ্রীচৌইথমল-এর সঙ্গে যাবার সময়।

যোধপুরের গ্রামীণ বিজ্ঞান সমিতি-র পক্ষ থেকে নতুন খড়িন তৈরির কাজ হয়েছে। ঠিকানা হল : পোঃ-জেলু গগাড়ি। যোধপুর।

জ্ঞানী ও সোজা-সরল গোয়ালার সঙ্গে যে কথোপকথন তা আমরা জানতে পারি শ্রীজেঠুসিং-এর কাছে। পূর্ণ সংবাদটি হল :

সুরজ রো তো তপ ভলো, নদী রো তো জল ভলো
ভাঈ রো তো বল ভলো, গায় রো তো দুধ ভলো
চারোঁ বাতোঁ ভলে ভাই, চারোঁ বাতোঁ ভলে ভাই

সূর্যের তাপ ভালো, নদীর জল, ভাইয়ের বল ভালো এবং গাইয়ের দুধ। এই চার ভালই হয়।

গোয়ালা উত্তর দেয় :

আখঁ রো তো তপ ভলো, করাখ রো তো জল ভলো
বাহু রো তো বল ভলো, মা রো তো দুধ ভলো
চাঁরো বাতোঁ ভলে ভাই, চারোঁ বাতোঁ ভলে ভাই

তপস্যা হল চোখের, অর্থাৎ অনুভবই কাজে লাগে। পানি 'করাখ' অর্থাৎ কাঁধের ওপর ঝোলানো কুঁজোর জল। নিজের বাহুবল-ই কাজে আসে এবং দুধ? মায়ের দুধের কোন তুলনা হয় না রে ভাই।

আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানীরা বলবেন বর্ষার পরিস্থিতি অনুযায়ী গোটা মরুভূমিই গম

চাষের উপযুক্ত নয় । যারা খড়িন তৈরি করেছিল এটা তাদেরই চমৎকারিত্ব বলতে হবে যে কয়েকশো বছর আগে থেকে তারা কয়েকশো মণ গম কেটে চলেছে। পলিওয়াল ব্রাহ্মণদের জন্যই জয়সলমের রাজ্য আনাজ ও ভুসিতে সমৃদ্ধ হয়েছিল।

দইবাধ বা দেবিবাঁধ-এর পরিচয় আমাদের দেন শ্রীজেঠুসিং ও শ্রীভগবানদাস মহেশ্বরী। ঐ এলাকায় প্রকৃতি দেবী যতগুলি এইরকম স্থান তৈরি করেছেন তার মধ্যে এমন কোনো জায়গা নেই যেটি সমাজ চোখের তপস্যায় দেখতে পায়নি। এই অচ্ছেদ্য সম্পর্ক এখানে চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। শিক্ষিত সমাজ যদি পড়তে না পারে, সে কথা আলাদা ।

ভুনের’ বারো মাস

ইন্দ্রের এক মুহূর্তকে নিজেদের জন্য বারমাসে বদলে ফেলে যে সমাজ, সেই সমাজের একটি দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই বিকানেরের ভিনসর গ্রামে গোচরভূমিতে তৈরি রামসাগর নামক সাঠি কুয়োটিতে। এখানে আমরা পৌঁছাই শ্রীশুভু পাটওয়ার সৌজন্যে।

ভুন ও ইন্দ্রের সমন্ধটি আমাদের বোঝান শ্রীজেঠুসিং। দেখতে পাওয়া যায় না যে পানি অর্থাৎ ভূ জল, তাকে দেখতে বা অনুভব করতে পারে যে সিরবি এবং এত গভীর কুয়ো খোঁড়ে যে কিনিয়ারা, তাদের পরিচয় আমরা পাই শ্রীদীনদয়াল ওঝার কাছে। ফাঁক খোঁড়ার রহস্য আমাদের বোঝান শ্রীকিসান বর্মা। বারিক পলেস্তারার কথাও তিনিই আমাদের বলেন।

বাউড়ি, পগবাও এবং ঝলরাগুলির বিষয়ে এই অধ্যায়ে আলাদা করে কিছু দেওয়া যায়নি। কিন্তু কুয়োর মতো এগুলিরও এক অতি বৃহৎ ঐতিহ্য আছে। এমনিতে তো বাউড়ি দিল্লির কনট প্লেসে পর্যন্ত পাওয়া যাবে, কিন্তু দেশের মানচিত্রে এর একটা বিশেষ অঞ্চল রয়েছে। এই অঞ্চলটা পড়ে গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে।

রাজস্থানের এই বৈভব আমাদের প্রথম দেখান চাকসুর শরদ জোশি। ওনার সঙ্গেই আমরা টোঁক জেলার টোডা রায়সিংহ বাউড়িটি দেখতে যাই । এই বাউড়িটির সিঁড়িতে চড়েই আমরা অনুভব করতে পারি বিস্মিত হওয়া কাকে বলে। বইয়ের প্রচ্ছদটি করা হয়েছে এই বাউড়িটির ছবি দিয়েই। গান্ধী শান্তি কেন্দ্র হায়দরাবাদ এবং গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠান দিল্লি এই ছবিটি একটি পোষ্টারের মতো করে ছেপেছে। রাজস্থানের অনেক জায়গাতেই তৈরি, যা এখন প্রায় সব জায়গাতেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেই বাউড়িগুলির পরিচয় আমাদের দেন শ্রীশরদ জোশি। রাষ্ট্রদূত সাপ্তাহিকের ১৯৯৮-এর ১৮ জুনের

সংখ্যায় অশোক আত্রেয় রাজস্থানের বাউড়িগুলির একটি লম্বা সূচি দিয়েছেন। রাষ্ট্রদূত সাপ্তাহিকের ঠিকানা হল : সুধর্মা, এম.আই. রোড, জয়পুর।

চড়স, লাব ও বরত সম্পর্কিত অধিকাংশ তথ্যই আমরা পাই দীনদয়াল ওঝার কাছে। 'বারিয়ো'রা যে সমাজের কাছে সম্মান পেত সেকথা আমাদের বলেন শ্রীনারায়ণসিং পরিহার। তার ঠিকানা হল : পোঃ-ভিনাসর, বিকানের। জয়সলমেরের বড়াবাগে কাজ করেন শ্রীমঘারাম। তিনিই আমাদের 'শুন্ডিয়া'র পরিচয় দেন।

সারণে জল টেনে তোলে যে বলদ বা উট তাদের ক্লান্তির দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়। ভুনের সঙ্গে আরও একটা চরকি লাগানো হয় যেটাতে একটা লম্বা দড়ি বাধাঁ থাকে। বলদের প্রতিটি ক্ষেপে দড়িটি আটকে যায়। পুরো দড়িটি জড়িয়ে গেলেই বোঝা যাবে বলদ জোড়া পাল্টাতে হবে। পশুদেরও পরিশ্রমের এত খেয়াল রাখে যে পদ্ধতি সম্ভবত আজ এর প্রচলন উঠে গেছে। তবুও পুরোনো শব্দকোষে এটি ডোরা নামে পাওয়া যায়।

ফলৌদি শহরের শেঠ শ্রীসাঙ্গিদাসজির কুয়োর প্রাথমিক তথ্য আমাদের দেন জয়পুরের শ্রীরমেশ থানবী। এরপর এর বিস্তৃত তথ্য পাওয়া গেল শ্রীমুরারিলাল থানবীর কাছে। শ্রীসাঙ্গিদাসজির পরিবারের পুরনো গল্প আমাদের শোনান শ্রীমুরারীজির বাবা শ্রীশিবরতন থানবী। থানবী পরিবারের ঠিকনা হল : মুচি গলি, ফলৌদি, যোধপুর। উৎকৃষ্ট গজধরেরা দীর্ঘ দিন আগে যে কুয়োটি পাথরে তৈরি করেছিল, সেটি আজ কাগজে আঁকতে ভালো ভালো বাস্তুকারেরও ঘাম ছুটে যাচ্ছে। কুয়োর প্রারম্ভিক নক্শা তৈরি করতে আমাদের সাহায্য করেন দিল্লির বাস্তুকার শ্রীঅনুকূল মিশ্র। বিকানের-এর বিশাল চৌতিনা কুয়োর পরিচয় আমরা পাই শ্রীশুভু পাটওয়ার ও শ্রীওম থানবির কাছে। এই রকম উন্নত কুয়ো শহরে আরও রয়েছে। এগুলি সবই বিগত দু-আড়াইশো বছর ধরে মিষ্টি জল দিয়ে চলেছে। প্রায় সবগুলোই এত বড় যে পাড়াগুলোবও নামও হয়েছে ঐ কুয়োটির নামেই।

কুয়োর জলে সেচের কাজ চলত এরকম এলাকাও মরুভূমিতে প্রচুর ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাসবিদ্ নৈণসী মুহণোত যে সমস্ত তথ্যমূলক গ্রন্থ লেখেন তাতে বিভিন্ন জায়গায় তিনি কুয়োর পরিস্থিতি, চাষবাস, সেচের ব্যবস্থা, কুয়ো-পুকুরের গণনা ও জল কোথায় কত গভীর এসব কিছুর ওপর আলোকপাত করেন। তাঁর লেখা 'পরগনা রী ওয়িগত' নামক গ্রন্থে ১৬৫৮-৬২ সাল পর্যন্ত যোধপুর রাজ্যের বিভিন্ন পরগনার রির্পোট পাওয়া যায়। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীভঁবর ভাদানি এই বিষয়ের ওপর অনেক কাজ করেছেন। আরও কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে মনোহরসিং রানাওত-এর বই 'ইতিহাসকার মুহণোত নৈণসি ঔর উনকে ইতিহাস গ্রন্থ' নামক বইয়ে। বইটির প্রকাশক : রাজস্থান সাহিত্য মন্দির, সোজতি দরওয়াজা, যোধপুর।

কুয়োর চাতালে অনেকসময় কাঠের তৈরী একটি পাত্র রাখা থাকে। এর নামই হল কাঠড়ী। কাঠড়ী তৈরি করে কুয়োর পাড়ে রাখা পুণ্যের কাজ মনে করা হয় এবং কাঠড়ী চুরি করা বা ভেঙে ফেলা খুবই পাপ। পাপ পুণ্যের এই অলিখিত পরিভাষা লিখিত রয়েছে সমাজের মনে। পরিবারের কোনো মাঙ্গলিক মুহূর্তে বা ভালো উপলক্ষে গৃহস্থ কাঠেড়ী তৈরি করে কুয়োর পাড়ে রেখে আসে। এর পর এটি এখানে বছরের পর বছর রাখা থাকে। কাঠের পাত্র অসাবধানতাবশত কখনও কুয়োতে পড়ে গেলেও ডোবে না। আবার উঠিয়ে এটি ব্যবহার করা হয়। কাঠের পাত্রে ছোঁয়াছুঁয়ি ও জাতপাতের বিচারও ভেসে যায়।

শহরে ফ্রিজের ওপর রাখা দু পয়সার যে প্লাসটিকের গেলাসটি লোহার চেন দিয়ে বাঁধা থাকে সেটির সঙ্গে এর তুলনা করুন।

স্বাবলম্বী সমাজ

রাজস্থানের বিশেষভাবে মরুভূমির সমাজ জলের এই কাজকে গর্বের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ জানায়নি। সত্যি সত্যি বিনম্রতা সহকারে কর্তব্যের মতোই তা সম্পন্ন করেছে। তারই সাকার রূপটি আমরা কুঁই, কুয়ো, টাঁকা, কুণ্ডি, পুকুর প্রভৃতিতে দেখতে পাই। এই কাজের মধ্যে একটি নিরাকার রূপও বিরাজমান, তবে এই নিরাকার রূপটি ইঁট বা পাথরের নয়। এ হল স্নেহ ও ভালোবাসার, জলের মিতব্যয়িতার। এই রূপ সমাজের মানুষের মনের আগৌরে তৈরি করা হয়েছিল। যেখানে মন প্রস্তুত, সেখানে শ্রম এবং পুঁজিও পাওয়া গেল। এর জন্য বিশেষ প্রয়াস করতে হল না, অনায়াসেই হতে লাগল। রাজস্থানের জলের কাজের স্বরূপটিকে বুঝতে আমরা এর সাকার রূপের উপাসকদের এবং নিরাকার রূপের উপাসকদের উভয়ের কাছেই সাহায্য পেয়েছি।

বটসোয়ানা, ইথিওপিয়া, তানজানিয়া, কেনিয়া, মালাওয়ি প্রভৃতি জায়গায় পানীয় জলের জোগান দেওয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা চলছে সে খবর আমরা পাই ১৯৮০ সালে মালাওয়ি দেশের জোম্বা শহরে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনের রিপোর্ট থেকে। রিপোর্টটি অবশ্যই কিছুটা পুরোনো কিন্তু আজও যে সেখানকার পরিস্থিতি কিছু উন্নত হয়েছে সেকথা মনে হয় না। কিছু উন্নতি যদি হয়েও থাকে তা তবে হয়েছে ভুল পথে । মালাওয়ি সরকার কানাডার দুটো সংস্থার সঙ্গে এই সম্মেলন করে। সংস্থাগুলি হল ইন্টারন্যাশানাল ডেভলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার ও কেনেডিয়ান ইন্টারন্যাশানাল ডেভলপমেন্ট এজেন্সি।

প্রায় একশোটি দেশে ছড়িয়ে থাকা মরুভূমিতে জলসমস্যার সমাধানে যে প্রয়াস চলছে, তার কিছু তথ্য আমরা পাই আমেরিকার ওয়াশিংটন শহরে অবস্থিত ন্যাশানাল আকাদেমি অফ সায়ান্সেস-এর পক্ষ থেকে ১৯৭৪ সালে ছাপা বই 'মোর ওয়াটার ফর এরিড ল্যান্ডস; প্রমিসিং টেকনোলজিস এন্ড রিসার্চ অপরচুনেটিস'। এতে নেগেওয়ে মরু রাজ্যের (বর্তমান ইজরায়েলে অবস্থিত) বর্ষা, হাজার দ-ুহাজার বছরের পুরোনো বৃহৎ জলসংগ্রহ পদ্ধতির উল্লেখ অবশ্যই পাওয়া যায় কিন্তু তার বর্তমান পরিস্থিতির সঠিক খবর পাওয়া যায় না। বর্তমানে তো এখানে কমপিউটারে চাষ ও ড্রিপ পদ্ধতিতে সেচের এতই প্রচার যে আমাদের দেশের রাজস্থানের, গুজরাতের নেতা ও সমাজসেবকরা ইজরায়েল দৌড়াচ্ছে এই পদ্ধতি শিখতে ও এখানে নিয়ে আসতে।

এই ধরনের বইগুলিতে প্লাসটিকের চাদর দিয়ে আগৌর তৈরি করে বর্ষার জল সংগ্রহ করার পদ্ধতি খুবই উৎসাহের সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। কোথাও তো বলা হচ্ছে মাটির ওপর মোম ছড়িয়ে দেওয়ার পদ্ধতি প্লাসটিকের থেকে সস্তা এবং ভালোও।

ভালো কোনো পদ্ধতি ওখানে নেই একথা বলতে ভয়ই লাগে। একটা পদ্ধতি অবশ্যই পাওয়া যায়; সোজা কুয়োর বদলে আড়া কুয়ো। এই ধরনের কুয়ো ইরাক, ইরান প্রভৃতি জায়গায় তৈরি হোতো। একে কওয়ন্টা বলা হয়। এতে পাহাড়ের তেরছা অংশ খুঁড়ে ভূ জলের সঙ্গে পাহাড়ের স্তরের জলও সংগ্রহ করা হয়।

রাজস্থানে এই সব কাজ নিজেদের সম্পত্তি ও সাধনাতেই হয়েছে। এখানকার সকল কাজই সিমেন্টের বদলে চুন সুরকিতেই হতে থাকে। সিমেন্ট ও চুন-সুরকির একটু তুলনা করে দেখা যাক : চুন সুরকির কাজ জলে ভেজাতে হয় না। সিমেন্টে হয়। সিমেন্টের কাজে, কাজ হয়ে যাওয়ার বারো ঘণ্টা পর থেকে কম পক্ষে তিন চার দিন জলে ভেজাতে হবে। সাতদিন হলে আরও ভালো। ভেজানো না হলে অর্থাৎ জল না পেলে সিমেন্টের কাজে ফাটল দেখা দিতে থাকে।

এমনিতে চুন ও সিমেন্ট একই পাথর থেকে তৈরি হয় কিন্তু তৈরি করার পদ্ধতি এদের চরিত্র পাল্টে দেয়। সিমেন্ট তৈরির জন্য পাথরগুলোকে মেসিনে খুবই মিহি করে পিষে নেওয়া হয়। এর পর তাতে এক বিশেষ প্রকারের বালিযুক্ত মাটি মেশানে হয়। চুন করার জন্য চুনাপাথরগুলিকে প্রথমে ভাটিতে পোড়ানো হয় তারপর বালি ও কাঁকর মিশিয়ে চাকতিতে পেষা হয়।

একই পাথরের আলাদা আলাদা ব্যবহার, তার স্বভাব পাল্টে দেয়।

সিমেন্ট জলের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শক্ত হতে থাকে। একে ইরাংজিতে সেটিং টাইম বলে। বলা হয় এই সময়টা হল আধ থেকে এক ঘণ্টা। এই প্রক্রিয়া দুই

থেকে তিন বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। এরপর সিমেন্টের শক্তি কমতে থাকে। শক্ত হওয়া ও জমার সঙ্গে সিমেন্ট সঙ্কুচিতও হতে থাকে। বই-এ এই সময়টা ত্রিশ দিন বলা হয়েছে কিন্তু ব্যবহারকারী মনে করে তিন দিন। ঠিকভাবে সংকুচিত হয়ে, শক্ত হয়ে সিমেন্ট বইয়ের হিসেবে চল্লিশ বছর পর্যন্ত এবং ব্যবহারকারীর হিসেবে খুব বেশি হলে একশো বছর পর্যন্ত টিকে থাকে।

চুনের স্বভাবে কিন্তু প্রচুর ধৈর্য। জলের সঙ্গে মিশে তা জমতে শুরু করে না, গারাতেই তা এক দু-দিন পড়ে থাকে। জমা, শক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া দু-দিন থেকে দশ দিন পর্যন্ত চলতে থাকে। এই সময় তাতে ফাটল হয় না কেননা জমার সময় এ সংকুচিত হয় না বরং ছড়িয়ে যেতে থাকে। তাই জমার সময় এটিকে সিমেন্টের মতো ভিজিয়ে রাখতে হয় না। এই সময় এটি ছড়াতে থাকে এবং তাই উইপোকাও লাগে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি শক্ত হতে থাকে ও এর ঔজ্বল্যও বাড়তে থাকে। ঠিকঠাক রক্ষণাবেক্ষণ হলে এর সময়কাল দু-চার বছর নয়, দুশো থেকে ছশো বছর হয়। ততদিন পর্যন্ত সিমেন্টের পাঁচ-সাত প্রজন্মের দাহকার্য সম্পন্ন হয়ে যায়।

আরও একটা তফাত রয়েছে দুয়ের মধ্যে। চুনের কাজ জলকে চুঁইয়ে যেতে কোনো অবকাশ দেয় না কিন্তু সিমেন্ট জল আটকাতে পারে না প্রতিটি শহরেই খুব ভালো ভালো ঘর, ইমারতের দেওয়াল, ট্যাংক প্রভৃতি সকলেই একথা চিৎকার করে বলছে দেখতে পাওয়া যাবে।

তাই চুনে তৈরি টাঙ্কিগুলিতে জল চুঁইয়ে চলে যায় না। এরকম টাঁকা, কুণ্ড, পুকুর দুশো তিনশো বছর পর্যন্ত গর্বের সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাওয়া যাবে। চুন সুরকির কাজের যে শাস্ত্র, সমাজ ও রাষ্ট্রের নির্মাণে সেই শাস্ত্রের জ্ঞাতা কারিগরদের দেহ, মন এবং সম্পত্তির তপস্যায় রত তাপসদের আজও বিশাল ভূমিকা রয়েছে।

কিছু শব্দার্থ

পধারো মাহ্‌রে দেশ -

১. অতীতে অনেকবার দীর্ঘ সময় ধরে রাজস্থানের বর্তমান মরু অঞ্চলে সমুদ্র বিরাজ করেছে। সার্মো কার্বোনিফেরাস ভূতাত্ত্বিক যুগে পশ্চিম যোধপুর ও জয়সলমের অঞ্চল পুরোপুরি সমুদ্রের তলায় ছিল। ক্রিটাসিয়াম যুগের শুরুতে সমুদ্র পিছিয়ে গেলেও মধ্যপর্বে আবার তা এগিয়ে আসে এবং পরিশেষে মায়োসিন ও প্লায়োসিন যুগে স্থায়ীভাবে পিছিয়ে যায়। মরুভূমির অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই অর্জিত হয়েছে তারও পরে, প্লায়োস্টাসিন তুষারযুগের সমাপ্তির পর। কয়েক কোটি বছর আগেকার অবক্ষেপণ ও বিশেষ ধরনের মাটি ও ভূমিরূপই নির্ভুলভাবে জানিয়ে দেয়, সেই সময়ে মরুভূমির বদলে এই অঞ্চলে ছিল দিগন্তবিসারী সমুদ্র।

২. মাঙ্গাণিয়া ; লাঙ্গা : সঙ্গীতে প্রসিদ্ধ রাজস্থানের বিশেষ জাতি।

৩. ধরতি ধোরা রি : ধোরা অর্থাৎ বালির টিলা। যে ধরিত্রী তে পর্বতের মত বড় বড় বালির টিলা থাকে, তাকেই ধরতি ধোরা রি বলা হয়েছে।

মাটি, জল ও তাপের তপস্যা

১ গুগরি— রাজস্থনে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে এই গুগরি তৈরী করার প্রচলন দেখা যায়। গম, ছোলা ও কখনও আটা সব একসঙ্গে সেদ্ধ করে তাতে ভুরা(দেশিয় চিনি) মিলিয়ে গুগরি তৈরি হয়।

২. আসলে বালির টিলাগুলো কখনোই একই জায়গায় স্থায়ীভাবে অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে না। প্রবল বাতাসে উড়ে আসা বালি স্তুপ হয়ে জমে উঠে যেমন এই টিলাগুলি তৈরি হয়, তেমনি বাতাসের গতি বদলে গেলে ওই বালি আবার অন্যত্র উড়ে গিয়ে স্তুপ হয়ে নতুন টিলা সৃষ্টি কর। মরুভূমিতে বালির পুরোনো টিলাগুলি বাতাসের গতির অনুকূলে একটু একটু করে স্থান পরিবর্তন করে— এই ঘটনা অতি স্বাভাবিক। টিলাগুলির এই গতিশীল চরিত্রকেই মূল পাঠে আলঙ্কারিক অর্থে 'ডানা মেলে উড়ে বেড়ানো'র সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

৩. ভূমিক্ষয়, ভৌমজলের অবস্থান, বৃক্ষছেদন, বালিয়াড়ি ও বাতাসের পরিবর্তনশীল চরিত্র প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবিক কারণে মরুভূমির সীমানা ক্রমশ বেড়ে যেতে পারে। মরুর ভিতরে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থিত গ্রাম ও শহরগুলির পক্ষে মরুভূমির এই ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি এক জীবনমরণ সমস্যা। থর মরুভূমিও এর ব্যতিক্রম নয়।

বৃক্ষরোপণ উৎসব, বালিয়াড়িগুলিতে ঘাস ইত্যাদি লাগিয়ে তাকে স্থায়ী করার চেষ্টা, বাতাসের গতির বিপক্ষে আড়াআড়িভাবে একাধিক সারিতে শেল্টার হিসেবে বড় গাছ লাগিয়ে

তার গতি কমানোর উদ্যোগ, ভৌমজলের উন্নতিসাধন প্রভৃতি বিভিন্ন পরিকল্পনা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার থেকে কার্যকরী করার চেষ্টা হয়েছে। সুফল কিছু কিছু পাওয়া গেলেও মরু প্রসারের সমস্যা আজও সম্পূর্ণরূপে সমাধান করা যায়নি।

৪. দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী নিচু উপত্যকা মতো অঞ্চল কে বলে দররো। আরাবল্লীর এই রকম সব অবনমিত অঞ্চল থেকে বাতাসের ধাক্কায় বালি উড়ে গিয়ে আরো পূর্বে উল্লিখিত স্থানগুলিতে উঁচু নিচু টিলার আকারে জমা হয় ও মরু বিস্তারে সাহায্য করে।

৫. ওম-গোম : ওম অর্থাৎ আকাশ, গোম অর্থাৎ পৃথিবী।

৬. আউগাল : বর্ষা আগমনের প্রথম সংকেত বা প্রথম দিন। (আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে, এই ভাবে বলা যেতে পারে।)

৭. যেখান থেকে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করা হয়, সেই জায়গাটা হল আগৌর।

৮. বর্ষার চার মাসকে বলা হয় বরসালি বা চৌমাসা।

থেমে থাকা জল নির্মল

১. রামরজ এক প্রকার গেরুয়া রঙের মাটি

বিন্দুতে সিন্ধু

১. কবীরের একটি প্রবচন হল

'সাঁই ইতনা দিজিয়ে জ্যামেঁ কুটুম সামায়
ম্যাঁ ভি ভুখা ন রহুঁ সাধু ন ভুখা যায়।'

হে প্রভু এতটুকু অন্তত দিয়ো, যাতে আমিও ক্ষুধার্ত না থাকি, অতিথিকেও ফিরিয়ে দিতে না হয়। কিন্তু জলের ব্যাপারে রাজস্থানের ঐতিহ্য এতটাই সমৃদ্ধ যে, যতটুকুই বৃষ্টি হোক তাতেই তাঁরা নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে নিতে সক্ষম।

২. তিজ রাজস্থানের একটি অতি সুন্দর উৎসব। শ্রাবণের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে মহিলারা পূর্ণ শৃঙ্গারের সঙ্গে পালন করেন এই উৎসব।

'ভুনের' বারোমাস

১. খেলিয়াঁ— এটি খেল শব্দের বহুবচন। খেল শব্দের অর্থ হল, পাথর অথবা সিমেন্টের বড়-সড় পাত্র বা চৌবাচ্চার মতো। এতে পশুদের জন্য জল ভরে রেখে দেওয়া হয়। গরমকালের চার মাস শহর, গ্রাম, গোচারণভূমি এমনকী কখনও তো জঙ্গলের মধ্যেও গৃহস্থেরা নিজেদের খরচায় কুয়ো বা পুকুর থেকে এগুলিতে জল ভরিয়ে বা ভরে রেখে দেয়। মরুভূমির এই যে উদার ব্যবস্থা, এটি এখনও নষ্ট হয়ে যায়নি ।

২. হোড়, অর্থাৎ স্পর্ধা।

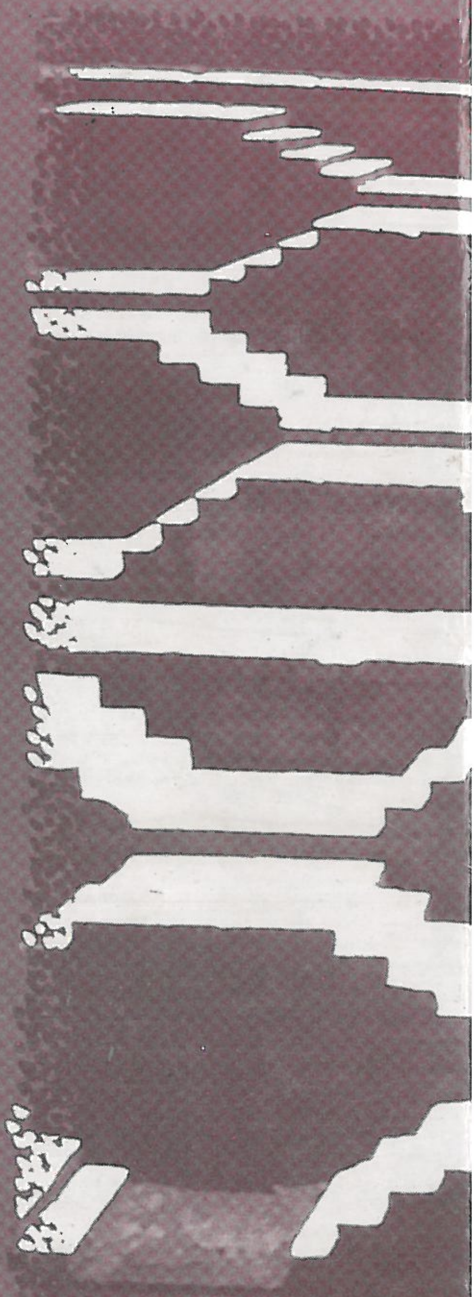

আশাবরী